কাজলদীঘির হাসপাতাল

বেদুইন

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৪/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র পাল (বাচ্চু)
মুদ্রাকর : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাইতি : জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্রনাথ স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

চন্দন (যশোদীপ) ও ঝর্মি (সমিতা)-কে

—ঃ আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ঃ—

সিয়া একটি গোপন চক্র
অনুবোষ্টুমীর আখড়া
হ্যানয় থেকে সায়গন
মানবাত্মার সন্ধানে
বন্দীর কারাগার
যশাইতলার ঘাট
উলঙ্গ বুভুক্ষা
পথে প্রান্তরে
অতঃ কিম্ !
অন্তরে রাধা

এক

কলকাতা থেকে অনেক দূরের ছোট্ট শহর। শহরের গা বেয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। শহরবাসীর ত্রাস এই নদী। তিনশত বৎসর ধরে রাজারা বাঁধ দিয়ে শহর রক্ষার চেষ্টা করে এসেছে। বর্তমান প্রশাসন বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করে আসছে বিগত কয়েক বৎসর ধরে। তবুও বর্ষায় বাঁধ ভাঙ্গলে নিরাপদ এলাকায় বসতি করে শহরবাসী, যেন নতুন উপনিবেশ কিন্তু শহর ছেড়ে পালায় না কেউ-ই। শহরের ওপ্রান্তে বাংলো প্যাটার্ণের ছোট্ট একটা বাড়ি নদীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক বছর ধরে। চোদ্দ পনের বছর আগে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন কল্‌কাতা থেকে। প্রায় এক বিঘে জমি অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করে একজন ঠিকাদারকে বাংলো তৈরির প্ল্যান ও অর্থ দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন স্ব-স্থানে। শালকাঠের খুঁটি দিয়ে বাংলোটা তৈরি হয়েছিল উপরে টিনের ছাউনি দিয়ে আর মেঝে তৈরি হয়েছিল কাঠের পাটাতন দিয়ে। স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী করেই তৈরি হয়েছিল বাংলোখানা। অবশ্য ছয় ফুট উঁচু ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছিল চৌহদ্দি। প্রবেশপথে লোহার গেট, আর গেট থেকে বাংলোর সিঁড়ি পর্যন্ত লাল শুরকির ছোট চলার পথ। দূর থেকে ছবির মত মনে হয় বাংলোখানা।

বাড়ি তৈরির পর অনেকদিন কোন বাসিন্দা না থাকায় তালাবন্ধ ছিল বাংলো। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকিয়ে দেখে আর গবেষণা করে মালিক সম্বন্ধে। হঠাৎ একদিন সবাইকে অবাক করে কলকাতা থেকে ট্রাক বোঝাই আসবাবপত্র এল, সঙ্গে এল বাড়ি দেখাশোনা করার দুজন কর্মচারি। কিছুকাল পরে সবাইকে অবাক করে এল অমলেন্দু লাহিড়ী, বোধহয় বাড়ির মালিক। এরপর থেকে মাঝে মাঝে অমলেন্দু এসে দুচারদিন বাস করত, যেমন আকস্মিক তার আগমন তেমনি আকস্মিকভাবেই তার প্রস্থান।

এরই কিছুকাল পরে অমলেন্দু শহরের বাংলোতে এসেই আমন্ত্রণ জানাতেন শহরের প্রবীন বুদ্ধিজীবিদের। তখন বাড়িটা যেন উৎসবে

মেতে উঠত। অমলেন্দু ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়ত পরিবেশ। এরপর কোন কোন সময়ে দু-চারজন অমলেন্দুর অনুপস্থিতি-কালে এসে সাময়িক আশ্রয় নিত বাংলোতে। তাদের সঙ্গে অমলেন্দুর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হত না। তারা অতি অভাজন যারা সাময়িক বিশ্রাম পেতে আসত।

সামনে ছোট বাগান। বাংলোর কর্মচারি দুজন বাগানটা নানা জাতের ফুলের চাষ করে অতি মনোরম করে রাখে পরিবেশকে। বাগানের আরেক প্রান্তে রয়েছে আনাজতরকারির ছোট্ট বাগান। মনিবের অনুপস্থিত-কালে কর্মচারি দুজন ব্যস্ত থাকে বাগানকে সাজিয়ে সতেজ রাখতে।

একদিন প্রতিবেশিরা দেখল গেটের পাশে পেতলের ফলক ঝোলানো হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে কণা মজুমদার।

যাতায়াতের পথে সবার দৃষ্টি পড়ে ওই নেমপ্লেট। এই বাড়িতে সময়ে সময়ে যারা আসাযাওয়া করে তারা বাড়ির মালিক ও কর্ম-চারিদের ভালভাবেই চেনে। কণা মজুমদারকে দেখবার সৌভাগ্য কারও হয়নি, তার সঙ্গে মালিকের কি সম্বন্ধ তাও কেউ জানে না। জানার চেষ্টা করেও কোন সঠিক উত্তর পায়নি। অমলেন্দুকে কণার কথা জিজ্ঞেস করেও কেউ সদুত্তর পায়নি। প্রসঙ্গান্তরে যেতে অমলেন্দু বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে তখন কঠোপনিষদের জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করত। একটা রহস্য যে পেছনে আছে তা বুঝে কণা-প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতে থাকে সবাই।

ধাঁধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি কেউ-ই, অমলেন্দুও ধাঁধার উত্তর দেয়নি। যাদের আগ্রহ বেশি তারা অনধিকার চর্চা না করে অমলেন্দুর আতিথেয়তা সাদরে গ্রহণ করত। আতিথেয়তা পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেছে। কণা মজুমদার পর্দার আড়ালে থেকেই গেল।

কণা মজুমদারকে সাক্ষাৎ না দেখলেও শহরের স্বনামধন্য উকিল জগদিন্দুবাবু কিছুটা এই মহিলার হদিস জানতেন। জমি ক্রয়ের দলিল তৈরি করেছিলেন জগদিন্দুবাবু। ওঁকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেও সদুত্তর পায়নি। তবে এইটুকু জানা গেছে এই বাংলোর মালিক অমলেন্দু নয়, মালিক কণা মজুমদার যিনি এতকাল পর্দার আড়ালেই থেকে গেছেন। দলিলে কণার স্বামীর নাম নেই। তার বাবার নাম রয়েছে শিবনাথ

মজুমদার। বাসস্থান কলকাতার উপকণ্ঠে তিলজলা এলাকায়। এর বেশি সংবাদ দিতে পারেননি জগদিন্দুবাবু। তিনিও কণা মজুমদারকে কখনও সাক্ষাৎ দেখেননি।

একজন প্রশ্ন করেছিল, তা হলে যে কোন মহিলা এর বাড়ির মালিকানা দাবী করতে পারে?

দাবী করতে পারে, বলেছিলেন জগদিন্দুবাবু, কিন্তু সেই দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে পারবে কি? মিথ্যে করে কোন কণা মজুমদারকে সনাক্ত করলে তার পরিণতি কি তা ত বোঝেন।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল কণা মজুমদারকে নিয়ে মাথা ঘামাবার লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কারও কোন আগ্রহ দেখা যায়নি কিছুকাল পরেই।

অমলেন্দু আসার খবর পেলেই তার কর্মচারিরা সর্বপ্রথম ব্রাসো দিয়ে পেতলের নেমপ্লেটটা ঘষে চকচকে করে। নেমপ্লেট যতটা চকচক হয় তার চেয়ে বেশি চকচক করে বাংলোটা —যখন অমলেন্দু শহরের গুণীজনদের নিয়ে আসর জমায় প্রতিটি সন্ধ্যায়। সে সময় ব্যস্ততা থাকে গোটা বাংলোয়। কর্মচারিরা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকরা নতুন করে ভাবে কণা মজুমদারের কথা, ভাবে অমলেন্দুর অনুপস্থিতকালে যাকে ভুলেই ছিল।

এই শহরে এলেই অমলেন্দু আমন্ত্রণ জানায় পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে। সন্ধ্যাবেলায় ধীরে ধীরে উপস্থিত হতে থাকেন যাঁরা তাঁরা রাতের ভোজনপর্ব শেষ করে যখন বাড়ির দিকে পা বাড়ান ঘড়িতে বারোটা বাজতে বিলম্ব থাকে না। সন্ধ্যা থেকে অত রাত অবধি যাঁরা টেবিলের সামনে বসে বিশ্ব জয় করেন, বিশ্বের তাবৎ সকল বিষয়বস্তু নিয়ে নরম-গরম আলোচনা করেন তাঁরা সবাই সুধীজন ও প্রাজ্ঞ। শহরের সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করে। অমলেন্দুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও যৌবনসুলভ তার স্বভাব। যৌবনের দীপ্তিতে বিশেষ ভাস্বর। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ শুধু কয়েকগোছা ধবল কেশরাশি। নইলে শিশুসুলভ চাপল্যে ঢেকে গেছে তার প্রৌঢ়চিত গাম্ভীর্য। যারা তার আমন্ত্রণে আসেন তাদের অধিকাংশই তার বয়ঃকনিষ্ঠ। অভ্যাগতদের অধিকাংশই কলেজের অধ্যাপক, দুএকজন ব্যবহারজীব আর নিত্যকার সঙ্গী দুজন অপাংক্তেয় ব্যক্তি। যাদের সোজা কথায় বলা যায় বেকার-বাউন্ডুলে। আসল পরিচয় অন্যরূপ। যাদের

সঙ্গে যেসব উন্নাসিক ব্যক্তি মোটেই ওঠাবসা করতে চায়নি তাদের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে তারাই তাদের অসাধারণ মননশীলতার মাধ্যমে। যাদের বিশেষ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি খ্যাতি আছে তাদেরও অনেক সময় হটে আসতে হয় ওদের কাছ থেকে। ওদের তীক্ষ্ন যুক্তি এবং সমাজ সচেতনা পণ্ডিত-মন্যদের লজ্জিত করে থাকে পদে পদে।

অমলেন্দুর দলে যারা নতুন অভ্যাগত তাদের প্রখর আভিজাত্যবোধ ও জ্ঞানের দম্ভ ওই সব বেকার বাউণ্ডুলেদের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। যারা এদের অপাংক্তেয় করতে পেরেছে তারাই কালক্রমে তাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অমলেন্দু সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করেনি। একবাক্যে সবাই তা মেনে নিয়েছে। নিজেদের উন্নাসিকতার জন্য লজ্জিত হয়েছে। এই আসর থেকে কেউ কেউ বিনা নোটিশে আসা যাওয়া বন্ধ করেছে। অবশ্য এখানেই শেষ, যারা আমন্ত্রিত অভ্যাগত তাদের কেউ কেউ ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে জটিল আলোচনায় ধৈর্য হারাতে দেখা গেছে। অশান্তি দলের নতুন সভ্য এই ইতিহাসের অধ্যাপক। আগমন মাত্র জল ঘুলিয়ে ফেলল উন্নাসিকতাকে মূলধন করে। সঙ্গীদের অনেকেই তার পরিচিত, অপরিচিত ছিল সমর সরকার আর নীতিশ গাঙ্গুলী। এদের সাথে প্রথম আগমন দিয়েই তার প্রথম পরিচয়। প্রথমদিনের ক্ষণ-স্থায়ী অবস্থানে তাদের স্ব-রূপ না দেখেই ফিরতে হয়েছিল। পরের দিন বাজার যাবার পথে চায়ের দোকানে ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে লুঙ্গি পরণে যে লোকটিকে গরম গরম বাক্যালাপ করতে দেখেছিল তাকে চিনতে নির্মল সেনের মোটেই কষ্ট হয়নি। গতরাতে এই লোকটির পাশে বসে থাকতে হয়েছিল,—এ কথা ভাবামাত্র নির্মল সেনের আভিজাত্যবোধ আহত হল তীব্রভাবে। মনে মনে স্থির করেন, এবার যদি তার দেখা হয় ঐ লোকটার সঙ্গে একই আসরে তা হলে একটা হেস্তনেস্ত না করে সে ছাড়বে না।

পরবর্তী আমন্ত্রণের দিন সমর সরকারকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে সে চুপি চুপি পাশের ঘরে ডেকে নিল অমলেন্দুকে। বলল, ঐ যে লোকটি বসে আছে ওর পরিচয় জানেন লাহিড়ীমশাই !

অমলেন্দু এরূপ ঘটনার সাথে বিশেষ পরিচিত। ঘটনাটি উপলব্ধি করতে তার বিলম্ব ঘটল না। কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, কোন্ লোকটা অধ্যাপক সেন ?

যে লোকটা আমার পাশের চেয়ারে বসে আছে।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে অমলেন্দু বলল, সমর সরকারের কথা বলছেন তো!

সমর কি অমর তা জানি না। তবে লোকটা অতি নোংরা। ওকে সহ্য করতে পারছি না।

অমলেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করল, কি করে জানলেন যে সমর সরকার নোংরা?

আমি নিজের চোখে দেখেছি একটা লুঙ্গি পরে চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিল।

নির্মল সেনের কথা শেষ হতেই অমলেন্দু হো-হো করে হেসে উঠল।

রুক্ষভাবে নির্মল সেন বলল, আপনি হাসছেন!

হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে অমলেন্দু বলল, পৃথিবীতে সবাই সব জিনিস পছন্দ করে কি! আপনার রুচিতে যা ভাল আমার রুচিতে হয়ত তা নয়, বরং সেটা নোংরা বলেই মনে হয়। নির্মলবাবু, দুনিয়াটা মোটেই নির্মল নয়, অনির্মলের সঙ্গে সহাবস্থানই নির্মলের পরিচয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব। সবাই আমার সম্মানীয় অতিথি, সবাই এসেছেন আমার আমন্ত্রণে, যোগ্য সমাদর জানানো আমার নৈতিক কর্তব্য। আপনি সবেমাত্র দুদিন এসেছেন, আমাদের এই আসরের সঙ্গে আপনার পরিচয় অসম্পূর্ণই আছে এখনো। আরও কিছুকাল এলেই আপনি খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। আমারও তো কিছু রুচিবোধ আছে। যদি কখনও কোন কারণে আপনাদের সম্মানহানি ঘটত অথবা ঘটবার উপক্রম হত তা হলে কি এতগুলো মাননীয় ব্যক্তিকে এক জায়গায় আনতে সাহস পেতাম! কখনই নয়। আমার জন্য অপরের সম্মান হানি ঘটবে, আর বিবেক বিবেচনা নিয়ে তাই আমি বরদাস্ত করব, এও কি চিন্তা করা যায়। অভিমান করে আপনার সাহচর্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না, তা হলে বড়ই ব্যথা পাব।

নির্মল সেন উত্তর খুঁজে পেল না। অমলেন্দুর কথায় আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ গভীর অনুযোগের যে রেশটুকু আপত ভেসে উঠেছিল তারই সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে নির্মল সেন এসে বসল তার আসনে। অনেকক্ষণ গুম হয়েই রইল। এদিকে তার অনুপস্থিতকালে তর্কের ঝড় উঠেছে আসরে।

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক মহিমবাবু উচ্চকণ্ঠে অচলার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। বাধা বোধহয় অপরপক্ষ থেকে গুরুতর ভাবেই উত্থাপন করা হয়েছিল। মহিমবাবু খেই না পেয়ে মিইয়ে যাবার সামিল এমন সময় অমলেন্দুর প্রবেশ তার পক্ষ শক্তিশালী হবার লক্ষণ মনে হল। তাকে নিজপক্ষের মুরুব্বি ঠিক করে মহিম বলল, আপনিই বলুন, অচলা ও সুরেশের প্রেম কি নিখাদ।

অমলেন্দু হেসে বলল, মোটেই নয়।

মহিম আত্মপ্রসাদ লাভ করে বলল, শুনলেন তো সমরবাবু !

সমর সরকার প্রস্তুত ছিল। মহিমের কথার পিঠে কথা দিয়ে শুরু করল, আমি যে কথা বলিনি সেটা নিয়ে আলোচনা করছেন কেন ? আমি তো অচলার কথা বলিনি ; বলেছি, সুরেশ অচলাকে ভালবাসত। তৎকালীন হিন্দুর সমাজপঞ্জী দিয়ে বিচার না করে আজকের এই পরিবেশ দিয়ে বিচার করুন। আজকের পরিবেশে সুরেশকে আমরা কোন ক্রমেই দোষী মনে করতে পারি না, বরং তাকে সাদরে গ্রহণ করাই ছিল স্বাভাবিক।

ইংরেজির শিক্ষক বিপুলবাবু এক টিপ নস্য টেনে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। সমরকে বাধা দিয়ে বলল, সুরেশ অচলাকে হয়ত ভালবাসত। তবে ঐ বয়সে কেউ কাউকে ভালবাসে এ কথা ঠিক বিশ্বাস করি না। কিন্তু অচলা যে সুরেশকে ভালবাসত এমন কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি। একজন ভালবাসে বলে অপরজন ঘর ভাঙ্গবে, এ কি একটা কথা। শেষ অবধি আদালতে যেতে হত না কি !

সমর দম ধরে ভাবল। বলল, অচলা অস্থির চিত্তের নারী। সে সুরেশকেও ভালবাসত না এবং মহিমকেও ভালবাসত না। একদিকে ছিল বিকারহীন আদর্শবাদীর স্থির চিত্ত, আরেকদিক ছিল আকস্মিকতার আবেগে ভরপুর একটি দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়। মহিমের সাথে বাস করেও বুঝাপড়া করে উঠতে পারেনি, হয়ত সুরেশের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করবার সুযোগ পেলে চিত্ত চাঞ্চল্য দলিত হত।

মহিম ডিস থেকে এক টুকরো সুপুরি তুলে মুখে দিয়ে বলল, বেচারা মহিম কি করত।

অনাদরে ষষ্ঠী হোত। হেসে বলল বিপুলবাবু।

অমলেন্দু এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। সহসা বাধা দিয়ে বলল, আপনাদের আলোচ্য বিষয় যে কি তা বুঝতে পারছি না। অচলা-সুরেশ-মহিম অথবা ভালবাসার মহিমা।

নীতিশ মৃদুস্বরে বলল, ভালবাসার মহিমা।

অমলেন্দু উৎসাহিত হয়ে বলল, ভালবাসা কোন রিজিড্ যাকে বলে স্থবির পদার্থ নয়। সদাই চাঞ্চল্য হল ভালবাসার ধর্ম। স্থিতিস্থাপকতা যেটুকু দেখি তা হল যৌনবোধের প্রাবল্যে অথবা আদর্শগত মানসিক সাম্যে অথবা পরস্পরের বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

নির্মল সেন সদ্য বিবাহিত। বিবাহের পূর্বেই পরিচয় হয়েছিল নন্দিতার সাথে। প্রেমের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করা নির্ভেজাল তারা। অন্তত নির্মল সেন তাই মনে করেন। অমলেন্দুর মন্তব্যে সে মোটেই খুশি হল না। প্রতিবাদের সুরে বলল, প্রেমের সাথে যৌনবোধের কোন সম্পর্ক নেই। আর আদর্শগত বিপর্যয় বলতে আপনি কি যে বলতে চান তা বুঝছি না।

অমলেন্দু হেসে বলল, ভালবাসা হল দেয়া-নেয়া, প্লেটোনিক মোটেই নয়। যৌনবোধ বাদ দিয়ে নরনারীর ভালবাসা মিথ্যাস্তোক মাত্র। মুখ ঘুরিয়ে জীববিদ্যার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, আপনি বলুন দ্বিজেনবাবু, দেহ আর মন দুটোই কি একাঙ্গী অথবা ভিন্ন!

দ্বিজেনবাবু প্রবীন অধ্যাপক। এই সব প্রেম উপাখ্যান তার ভাল লাগছিল না। তবুও অমলেন্দুর প্রশ্নের উত্তর দিল। অনিচ্ছার সাথে বলল একটা বাদ দিয়ে অপরটা চলতে পারে না।

অমলেন্দু ভারিক্কীচালে বলল, শুনলেন তো বিশেষজ্ঞের মত। আর আদর্শগত বিপর্যয় ঘটে সমাজের বা পরিবারের গাঁথুনিতে। আগের দিনে কলকাতার বাবুদের রক্ষিতা ছিল। স্ত্রী কোন অনুযোগ করত না, কেন না ভালবাসা আর ভোগ্যবস্তু ছিল তার প্রাপ্য। যৌনবৃত্তিটা নিয়ে স্বামী যেখানেই যাক তাতে দুঃখ ছিল না বরং আত্মমর্যাদার দম্ভ ছিল। এটা হল অস্থিতিস্থাপককে স্থিতিস্থাপক বলে চালু করবার পারিবারিক একটা গাঁথুনি, এর রূপান্তর বা নামান্তর বলতে পারেন আদর্শগত বিপর্যয়। এখন আমি যদি বলি, অচলার চিত্ত চাঞ্চল্যের সঙ্গে যৌন দুর্বলতা ছিল একটা অংশীদার, বোধহয়, তা হলে আপনি আপত্তি করবেন না।

সমর বাধা দিয়ে বলল, অচলার যৌন দুর্বলতা থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা বলব, অচলা অতি সহজেই সুরেশের সাথে ঘর বাঁধতে পারত, তাতে কোন বিঘ্ন ছিল না। ভালবাসা যেখানে বিনিময় প্রত্যাশী সেখানে মনকে ফাঁকি দিয়ে সতীপণার অভিনয় মর্মান্তিক। মানুষের এই ছোট্ট জীবনে যদি দাহন থাকে অনবরত, অতৃপ্তি আর অশান্তি হয় নিত্য সাথী, সে ক্ষেত্রে মানুষ জন্মাবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় শুধুমাত্র মনকে চোখ রাঙ্গিয়ে। নয় কি? বুঝাপড়া হয় না কোন মতেই।

নির্মল সেন এই রুচিহীন বক্তব্য আর সহ্য করতে পারছিল না। সরবে বলল, তা হলে বলতে চান রাম শ্যামের বউ নিয়ে পালিয়ে যাবে আর ঘর বাঁধবার অধিকার পাবে। সমাজের বুকে বসে তারা নিন্দনীয় জীবন নিয়ে মশগুল থাকবে। আর সমাজ তা সহ্য করবে।

সমর সরকার বিস্মিতভাবে নির্মল সেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। নির্মল সেন প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে যে উষ্মা প্রকাশ করল, সহজভাবে তা গ্রহণ করতে অনেকেই হয়ত পারত না। সমর সরকার সেদিক দিয়েও গেল না, নিজস্ব ভঙ্গীতে বলল, এ ক্ষেত্রে কি আমরা বুঝব না যে রামের সাথে শ্যামের বউয়ের প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম যৌবনের ভালবাসা কোন কালেই ভালবাসা নয়, সেটা হল চোখের নেশা। এ নেশা কাটিয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করতে অনেক কাল কেটে যায়। সেই নেশা কাটাতে গিয়ে ভালবাসাও অনেক সময় ঢিলে হয়ে যায়। পরিণত জীবনেই যৌনবোধ-ই বলুন অথবা সন্তানকেন্দ্রিক-ই বলুন, ভালবাসা জন্মায় পরস্পরের বোঝাপড়ার মাঝ দিয়ে। শ্যামকে যদি তার বউ ভালবেসে না থাকে, তার জন্য দায়ী কে? সমাজের অথবা পরিবারের মাথায় যারা থাকে তারা কতকগুলো আচার-আচরণ দিয়ে শাড়ির আঁচলে গিঁটছড়া দিয়ে যদি বলে, বিবাহ মানেই ভালবাসা, তা হলে সমস্যা মেটাবার দায়িত্বও তাদের নেওয়া উচিত ছিল। গিঁটছড়ায় ভালবাসা থাকে না। ওটা আপেক্ষিক বস্তু, রুচির বিষয়। শ্যাম তার স্ত্রীর ভালবাসা পায়নি। তার জন্য শ্যাম দায়ী। কেন না শ্যাম ও তার স্ত্রীর মূলগত ঐক্য রক্ষার দায়িত্ব বেশি ছিল শ্যামের। সে দায়িত্ব সে পালন করতে পারেনি বলেই সে অপরাধী।

নির্মল সেন তীক্ষ্নস্বরে বলল, দায়িত্ব কিছুই কি শ্যামের স্ত্রীর নয় ? যৌন আকর্ষণ-ই কি সব।

সমর বাধা দিয়ে বলল, অধ্যাপক সেন, আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? জীবমাত্রেয় যে দুটো জন্মগত বৃত্তি সেটা অস্বীকার করতে পারেন কি ! ক্ষুধাকে ভুলতে পারেন কি, অথবা ক্ষুধাকে বাদ দিয়ে চলতে পারেন কি ! আর যৌনবোধ, এটা বাদ দিয়ে চলতে পারেন কি ! কেউ পারেনি, আপনিও পারবেন না। যারা রুগ্ন অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক তাদের কথা বাদ দিন। যদি আমরা জন্মগত বৃত্তিকে বাদ দিয়ে চলতে না পারি তা হলে একথা কি স্বীকার করেন না যে ভালবাসা, মায়া, মমতা এগুলো ঐ সহজাত বৃত্তি দুটোই আমাদের শিখিয়েছে ? স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্ট অনুভূতিগুলোকে সব সময় বড় করে দেখলে বিচারে ভুল হয় না কি !

নির্মল সেন জবাব খুঁজতে থেমে গেল, এই অবসরে অমলেন্দু বলল, একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে ঘর বাঁধা আর ঘর ভাঙ্গার পেছনে রুচিবোধই আসল কথা। কার যে কোথায় মন আটকে যায় সে কথা আপনি আমি স্থির করতে পারি না, পারবও না। জানেন তো, Nothing is wrong in war and love—ভালবাসার ক্ষেত্রে যে War তাতে War এবং Love দুটোর মর্যাদা থাকে বলেই কোন অন্যায় কোথাও থাকে না। তাহলে শুনুন একটা গল্প। ঠিক গল্প নয়, আমার নিজের জানা ঘটনা।

মহিম আগ্রহ সহকারে বলল, কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছি, এবার বাস্তব ঘটনা দিয়েই বিচার করা হোক্। বলুন লাহিড়ীমশাই।

অমলেন্দু ঢোক গিলে বলল, তার আগে এক কাপ করে চা হোক্।

তা মন্দ নয়। বলল নীতিশ।

অমলেন্দু চায়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এসে বসল তার চেয়ারে।

বিপুল ব্যস্তভাবে বলল, আরম্ভ করুন।

কেউ রাগ করবেন না তো ?—নামধাম দেব না, কেন না প্রায় সবপক্ষই এখনও জীবিত। ঘটনাটা বলে চলব, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বলেই অমলেন্দু ভাল হয়ে বসল।

শুরু হল কাহিনী :

মেয়েটার নাম মনে করুন রমা।

তন্বী, রূপসী, শিক্ষিতা।

পরিচয় হল দীপক রায়ের সঙ্গে।

কেমন করে হল? নাটকীয় কিছু নয়। দীপক গৃহশিক্ষক রূপে এসেছিল।

দীপক লেখাপড়া শিখেছিল। কাজকর্ম বলতে যা আমরা বুঝি তা সে করত না। ঘরের খেয়ে ইংরেজ তাড়িয়ে বেড়িয়েছে চিরকাল। ইংরেজের পুলিশ তাকে শায়েস্তা করতে না পারলেও, স্বাধীন দেশের ভাগ্যবিধাতারা তাকে শায়েস্তা করেছিল নানাভাবে। দেশটা ভাগ করে প্রথম তাকে পথে বসিয়ে দিল সপরিবারে। তারপর আশ্রয় ও সাহায্য-প্রার্থী হয়ে যে মুষ্টিভিক্ষার যোগাযোগ তাতে ধিক্কার জন্মালো নিজের ওপর। তার স্বপ্নের স্বাধীনতাকে রূঢ় পদক্ষেপে মাড়িয়ে দিয়ে গেল বাস্তবের স্বাধীনতাভোগীরা। সে দেখতে পেল, যারা স্বদেশী করা মানুষদের নির্যাতন করেছে তারাই স্বচ্ছন্দে রয়েছে অথচ তার মত যারা দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেছে তারাই ফুটপাথে অনাহারে শেষদিনের প্রতীক্ষা করছে। নীতি মাইনাস, অর্থ ইজ ইকুয়াল টু অনাহার। সেই অনাহারের মুখোমুখি দাঁড়াল দীপক রায়, যার গলায় মালা পরিয়ে দিতে দেশে হুড়োহুড়ি লেগে যেত ইংরেজের আমলে।

রাজনীতির আসরে অর্থনীতির কঠিন কশাঘাত এল, স্ত্রীপুত্রকন্যাদের হাত ধরে দীপক খুঁজে নিল একটি নিকৃষ্ট আশ্রয়, আহার্যের সন্ধানে বেরিয়ে পেল ছাত্রী পড়াবার দায়িত্ব। সে ছাত্রী ঐ রমা।

পড়ানোর চেয়ে রাজনীতির বুলি বেশি কপচায় দীপক। রমা শুনে শুনে ভুলে যায় পাঠ্যপুস্তকের কথা। একদিন রমা আঁকড়ে ধরল দীপককে, বলল, আমাকে সঙ্গী করে নিন। আমিও লড়ব অনাহারীদের সঙ্গে।

দীপক হেসে বলল, পাগল। আমরা ভাল করে লেখাপড়া শিখতে পারিনি বলেই এত কষ্ট। লেখাপড়া শিখে রাজনীতি কর তা হলে শোভা পাবে। নইলে জীবনভোর দাদাদের গামছা, ছাতা বইতে বইতে হাতে কালশিরা পড়বে। অর্থনীতির উদরে রাজনীতির জন্ম। অর্থনীতির সূত্র ভুলে যারা রাজনীতি করে তারা আমার মত ফুটপাতে পড়ায়, বুঝলে শ্রীমতী!

রমা কি বুঝল, তা রমাই জানে। সে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি টপকাতে লাগল। দীপকও নিয়মিত তার পাঠকক্ষে হাজিরা দিয়ে চলল।

একদিন দুজনেই বুঝতে পারল কোথায় একটা অদৃশ্য হস্ত তাদের নিয়ে খেলা শুরু করেছে। দীপক দেবাদিদেব মহাদেব নয়, নইলে সেই অদৃশ্য হস্তকে ভস্মীভূত করতে পারত। অবশ্য তাতে লাভ কিছু হত না। প্রৌঢ় দেবাদিবকে যুবতী পার্বতীর পাণিপীড়ন করতে যখন হয়েছিল তখন অদৃশ্য হস্তকে রোধ করার কোন পথ ছিল না। ঘটমান জীবনে অঘটন ঘটানো সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

দীপক চিন্তিত হল।

রমা ভাবতে থাকে।

একদিন দুজনেই মন খুলে দিল। দুজনেই স্বীকার করল, আমরা ভালবাসি পরস্পরকে।

দীপকের চিন্তার আর শেষ নেই। সে বিবাহিত, সন্তানের পিতা। বুঝিয়ে বলল রমাকে। রমা সবই জানে, তবুও বাধা মানতে রাজি হল না। জীবনের প্রথম প্রেম সৌন্দর্যময় হয় বিঘ্নের মাধ্যমে। রমার মনে তাই অশান্তি আঁচড় কাটতেও পারল না। সে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠল।

এই দুর্যোগকে রোধ করতে দীপক মাঝে মাঝেই আত্মগোপন করতে লাগল। সপ্তাহ না পেরতেই রমা ছুটে আসত তার সন্ধানে। নতুন জীবনের প্ল্যান ঠিক করত। আকুলতার সাথে কাঁদত দীপকের বুকে মাথা রেখে। সহজ করে আশার বাণী শোনাতে পারে না দীপক, আবার অসরল ভাবে জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতেও সাহস পায় না। দীপক তখন দোদুল্যমান, একদিকে সংসার আরেক দিকে রমা!

নৈরাশ্য ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলল রমাকে।

এমনি করে কয়েকটা বছর কেটে গেল।

রমা অস্থির হয়ে উঠল। তার সব কর্মের মাঝ দিয়ে শাশ্বত নারী-মনটা মাথা উঁচু করে কেমন গোলমাল ঘটালো তার জীবনে। এই আধা প্লেটোনিক ভালবাসা নিয়ে সে বাঁচতে পারে না। সে চায় ঘর, সে চায় অবলম্বন, সে চায় পুরুষ-কঠিন আবরণ। দীপক তা দিতে পারেনি, পারবেও না। দীপক সমাজের সাধারণ রীতিগুলো ধরে থাকতে চায়,

দীপকের মনটা বিচার করে যদি বলতে হয় তা হলে জীবনে ব্যর্থতা অনিবার্য। দৃষ্টিভঙ্গী গেল বদলে, রমা আত্মগোপন করল, নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিল রমা।

ষোল বছরের রমার তখন তেইশ পেরিয়ে যাবার উপক্রম। সৌন্দর্যের ওপর বয়সের ছাপ পড়তে আরম্ভ করেছে। তার অজান্তেই ভোগ্যজীবনের আয়ু বুঝি শেষ হয়ে যায়। অস্থিরতার ব্যাপ্তি তাকে নতুনের সন্ধানে ঠেলে দিতে থাকে। এমন সময় পরিচয় হল সোমনাথের সঙ্গে। সোমনাথ অবিবাহিত, বেকার নয়। রমাকে নিরুৎসাহ করল না। গোপন প্রেমের পশরা মঞ্চে দেখা দিল। রমা-সোমনাথ বিয়ে করল রেজিষ্টারের বাড়িতে। দীপক জানলও না তা। যেদিন জানল সেদিন দীপক শামলা গায়ে চড়িয়ে প্রথম এল আদালতে ব্যবসা করতে।

সমর সরকার বলল, রমা ঠিকই করেছে। তারও তো জীবন রয়েছে, সে জীবনকে কি করে ব্যর্থ করবে সে।

অমলেন্দু হেসে বলল, আমিও আপনার সাথে এক মত। তবে ব্যতিক্রমও আছে। তাও ঘটেছিল দীপকের জীবনে। রমার বাস্তব-বুদ্ধিকে সম্মান দেখিয়েও বলতে পারি, সে যাচাই করতে পারত, সত্যই দীপক তাকে ভালবাসে কিনা। সে ভালবাসা প্লেটোনিক ছিল না, আধা প্লেটোনিক বলা যায় কিন্তু দীপফ সত্যিই তাকে ভালবাসত। সে ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। বৈষ্ণবীয় বিনয় দিয়ে ভালবাসাকে উপেক্ষাও করেনি কখনও। কেন না, যৌনবোধকে বাদ দিয়ে দীপক-রমার ভালবাসা গড়ে ওঠেনি। সতর্কতা ছিল মাত্র।

সমর হেসে বলল, দীপককে স্কাউণ্ডেল তৈরি করতে চান বুঝি।

তা আপনারা বলতে পারেন। দেয়া-নেয়া বাদ দিয়ে তো ভালবাসা নয়। মুখের কথায় যে প্রতিশ্রুতি তার স্থায়িত্ব কতটুকু। ব্যক্তি বিশেষে চিরকালের, আবার ব্যক্তিবিশেষে স্বল্পকালের। মনের সাথে দেহের সংযোগ অস্বীকার করলে জীবনের ছন্দ-পতন হয়। দীপক-রমা তা জানত, বিশেষ করে রমা এই জীবনকে প্রশ্রয় দিত।

তা বটে। এবার আরেক কাপ করে চা হোক। অভিরাম, ক' কাপ চা দাও বাপু। সমরই হাঁক দিল মালিক অমলেন্দুর বদলে।

অমলেন্দু আবার বলল, কতকগুলো ঘটনা দিয়ে বিচার না করলে

এ কাহিনীর নায়কের ওপর অবিচার করা হবে। নায়িকাকে যত সত্বর সার্টিফিকেট দিলেন, নায়ককে তা পারেননি। রমা যদি মনের কথাটি বলত দীপককে তা হলে দীপকের প্রতিক্রিয়া হয়ত অন্যরূপ হত। নায়কও হয়ত প্রশংসা পেত।

আশঙ্কা ছিল। হেসে বলল মহিম।

অহেতুক। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। মানুষের মন তো স্থবির নয়। সময়ের ব্যবধানে রমা ডুবে গেল। দীপকের বয়স বাড়তে লাগল, চুলে পাক ধরল, দাঁত পড়তে লাগল। কিন্তু রমার সঙ্গে যে তার ঘনিষ্ঠতা তা কোন দিনই গোপন ছিল না তার স্ত্রী মন্দিরার কাছে। রমা চলে যাবার আগেই শুরু হয়েছিল পারিবারিক কলহ, দীপকের জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্তিময়। সেই অশান্তির প্লাবনে দীপকের দেহে বার্ধক্যের ছাপ পড়ল।

দীপকের স্ত্রী মন্দিরা কাঁচা মেয়ে নয়। সে বোঝে মানুষের জীবনে দৈহিক সম্ভোগের শেষ আছে। কিন্তু পরিণত বুদ্ধির মানুষ যদ মন বাঁধা দেয় কোথাও সে মনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে নারী দেহের চেয়ে মনের খোরাক বেশি জোগায় তাকে সরিয়ে স্থান করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। রাজনীতির এই ছন্নছাড়া মানুষটিকে নিয়ে সারাটা জীবন সে কাটাল দুঃখ-দুর্দশার মাঝ দিয়ে আর শেষের বেলায় তাকে বাদ দিয়ে আরেকজন দাবার ঘুঁটিতে কিস্তিমাত করবে, এ যেন অসহ্য। শেষ বেলায় রমা হবে সুখের অংশীদার, কোন মতে সে তা বরদাস্ত করতে পারল না।

বুদ্ধিমতী হয়েও মন্দিরা ভুল করল। দীপক নিজের বিবেকের কাছে দোষী হতে চায়নি বলেই রমাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে, সেই রমাই যখন নিজের পথে চলে গেছে তখন মন্দিরার উচিত ছিল স্বামীর মনের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া, সে তা না করে অবিশ্বাসের আবহাওয়াতে শাসনের কঠিন অস্ত্র প্রয়োগ করে প্রায় নিরাময়প্রাপ্ত ক্ষতকে আরও বেশি বেদনাদায়ক করে তুলল। সাংসারিক জীবনটা করে তুলল অশান্তিময়। দীপকের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম। সে চাইল মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে। রাতের পর রাত জেগে সে ভাবল, সে অন্যায় করেছে কিনা। ভালবাসা যে অপরাধ নয় এ কথা বিশ্বাস সে করে। তারজন্য যে উৎপীড়ন, তার

যৌক্তিকতা তাকে ব্যথিত করে তুলল। ভালবাসা জানিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক রমা নেপথ্যে চলে গেছে স্বেচ্ছায়, তারজন্য রেখে গেছে লাঞ্ছনা আর দুঃখ, তবুও রমার ওপর সে রাগ করতে পারল না। কোন সময়ই ঘৃণা জন্মায় না তার মনে। রমাকে মনে মনে প্রশংসা করল তার বাস্তব বুদ্ধির জন্য।

দীপক হিসাব করে দেখল, সংসারে তার যা করণীয় ছিল সব সে করেছে। পুত্রবা উপার্জন করছে। কন্যারা স্বগৃহ পেয়েছে। মন্দিরা পেয়েছে গৃহ আর জীবনযাত্রার রসদ। তার করণীয় বলতে আর কিছু নেই। সবার অজান্তে একদিন পরিচয় সম্বল করে আইনের বই আর শ্যামলা আলমারিতে বন্ধ করে দীপক চলে গেল গৃহত্যাগ করে। সঙ্গে রইল নিজের লেখা বেদনাভরা কবিতার খাতা। আর রইল সমগ্র বিশ্বের জমিদারী। আহার্য ও আশ্রয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে এগিয়ে চলল নিরুদ্দেশের পথে।

কি করে কি হল জানা নেই। একদিদ পরিচয় হল সীমিতার সাথে। পথেই সে পরিচয়।

কে সীমিতা?—পরিচয় জিজ্ঞাসা করেনি দীপক। পরিচয় ক্লেদ বহন করতে পারে, তার চেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে যে মানুষটা তার বর্তমানকে সে শ্রদ্ধা করত মনপ্রাণ দিয়ে। সীমিতা তারপক্ষে যেন আশীর্বাদ।

সীমিতা যুবতী, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। রূপের চেয়ে বড় জিনিস ছিল সীমিতার, সে জানত মানবধর্ম।

দীপক প্রৌঢ়, সম্বল তার মনে তারুণ্য! বয়সের চেয়ে বড় জিনিস ছিল দীপকের, তা ছিল গভীর তিতিক্ষা।

নিজে নিজেই হাসল দীপক। অবাক কল্পনা! এ জীবনে কারও ভালবাসা সে পাবে, এ আশা তার নেই, ছিলও না। মূর্খের মত চেয়ে দেখল সীমিতাকে। কথা বলতে পারল না ভাল করে।

সীমিতা কেন ভালবাসল?—এ প্রশ্ন সীমিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল দীপক। সীমিতা হেসে বলেছিল, মানুষটাকে ভালবাসি না, ভালবাসি তোমার ব্যথাদীর্ণ ব্যর্থতা ভরা মনটা। সেই মনের সেবা করতে হলে তোমার দৈহিক উপস্থিতি তো বাদ দেওয়া যায় না। আমিও ভুক্তভোগী। এস আমরা সুখ দুঃখ দুজনে সমান ভাগ করে নেই।

সীমিতা যেন উঠে এল সমুদ্রমন্থনের অমৃত হাতে করে। দীপকের শুষ্ককণ্ঠে পাত্র নিঃশেষ করে অমৃত ঢেলে দিল।

কি করে যে এসব ঘটল তা সীমিতা নিজেও জানে না। সংসারে আঘাত সয়েই সে এগিয়ে এসেছে। নতুন আঘাত পেতে স্বেচ্ছায় কেন সে এল। মনের সকল শক্তি নিয়ে সে বলল, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মায়া, মমতা আমার সব সম্পদ তোমাকে দিলাম। আমি ও তুমি এক ও অভিন্ন।

দীপক চমকে উঠেছিল সীমিতার কথা শুনে। যখন জীবনের সীমা নির্দেশ হয়ে আসছে তখন সীমিতাকে নিয়ে সে কি করবে। কিছু তো দেবার নেই তার। ভিখারির মত হাত পেতেই থাকতে হবে জীবমানকাল। বলল সীমিতাকে। গম্ভীরভাবে দীপকের মুখের ওপর মুখ রেখে বলল, নিজেকে অত ছোট মনে করছ কেন, আমারই বা দেবার কি আছে। মাংসপিণ্ডের পবিত্রতা রক্ষা করতে করতে যাদের মনের সব সৌন্দর্য ও প্রসারতা এবং দেহের লাবণ্য ও ক্ষুধা অকালে লয় পায়, তারা পাবার আশায় উন্মুখ থাকে না। তারা দেবার নেশায় নিজেদের পরিপূর্ণতা আনতে চায়। আমাকে ওভাবে দুঃখ দিও না।

পরিপূর্ণতা এসেছিল নিশ্চিত। কেউ কখনও প্রশ্ন করেনি, তারা কে, কোথা থেকে তারা এসেছে। তবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে যে প্রত্যেকেই একটা মায়ামমতাপূর্ণ স্নেহের নীড় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সেটা তারা পেয়েছিল।

থামল অমলেন্দু।

বিপুল চিৎকার করে উঠল, বলল, Absurd—অসম্ভব! এ হতেই পারে না। একটা যুবতী একজন প্রৌঢ়কে ভালবাসতে পারে না। বাধ্য না হলে কোন যুবতীই প্রৌঢ়কে আপন করতে পারে না। It is horrible in your mythology—বাস্তব জগতে অসম্ভব।

কে বলল? সমর প্রশ্ন করল।

মানুষের ইতিহাস, উত্তর দিল বিপুল।

সে ইতিহাস ছিঁড়ে নতুন করে লিখুন। সীমিতার ভালবাসা বিচারের তৌলদণ্ডে সবচেয়ে মহনীয়। সীমিতা নিজেই বলেছে, সে ভালবেসেছে ব্যথাদীর্ণ একটা হৃদয়কে। দেহধারী মানুষ উপলক্ষ্য মাত্র। তবুও বলব, যুবক-যুবতীর ভালবাসা ভোগের আয়ু বৃদ্ধি করে। যুবতী প্রৌঢ়ের

ভালবাসায় জন্মায় নিখাদ প্রেম। ভোগ সেখানে গৌণ, মুখ্য হল ভালবাসা। যুবক-যুবতী ভালবাসতে জানে না, পারে না।

Certainly not—বাধা দিল মহি।

প্রবীন অধ্যাপক দ্বিজেনবাবু বলল, মনে হচ্ছে সমর right. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রণেতা পাল বাক' এই সৌন্দর্য ও বাস্তবতা সৃষ্টি করেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তার Good Earth বই লিখে। কি যে সম্ভব আর কি যে অসম্ভব, একথা বলা যায় না। জোর করে বলাটা অসঙ্গত।

ওটা আমাদের দেশের কথা নয়। বলল বিপুল।

মানুষ সব দেশেই সমান। সামাজিক পরিবেশে মনটা শুকিয়ে যায়, নইলে কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। য়ুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার মানুষের দেহের রঙ্ আলাদা হলেও মনের দিক থেকে সবাই এক।

অমলেন্দু বাধা না দিলে তর্ক আরও জমে উঠত। অমলেন্দু বলল, খাবার প্রস্তুত। সীমিতা আর দীপককে নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। সুখে থাকুক, তাদের প্রেম অক্ষয় হোক। এই তো! এবার আমরা উদর পূর্তি করে হৃদয় আর মস্তিষ্ককে নিরাপদ করি, আসুন। অভিরাম, খাবার দাও। মেয়েদের ভালবাসাটা যে আপেক্ষিক ও আত্মকেন্দ্রিক তা জেনেও দীপক নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সে এখনও হয়ত ভাসছে। আমরা ততক্ষণ নোঙর করি। আসুন।

ফেরবার সময় রাস্তায় এসে নির্মল সেন জিজ্ঞেস করল, কণা মজুমদার কে?

বিপুল সহাস্যে বলল, জানি না। জানবার দরকার হয়নি, তবে জানেন একজন, তিনি স্বয়ং লাহিড়ীমশাই।

তার কাছে কিছু শুনেছেন কখনও?—আবার জিজ্ঞাসা করল, নির্মল সেন।

উত্তর দিল সমর সরকার, বলল, না। অনাবশ্যক মনে করেছি। একবার নীতিশ জিজ্ঞেস করেছিল। উনি প্রথমে কঠোপনিষদের বাণী শুনিয়ে শেষ অবধি কণার অস্তিত্বও অপরোক্ষে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, ওটা name's sake মনে করুন!

নির্মল সেন গম্ভীরভাবে চলতে চলতে বলল, অত বড় নেমপ্লেটটা

কেউ name's sake টাঙ্গিয়ে রাখে কি! বিশ্বাস করতে পারছি না। কোথাও কোন রহস্য রয়েছে। বোধহয় প্রেমঘটিত।

বিপুল টিপ্‌পনি দিয়ে বলল, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজও হতে পারে। পরের affairs নিয়ে অত আগ্রহ কেন বাপু। উনি আমাদের common friend, আদর করে ডাকেন, গল্পগুজব করেন, খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরি। সজ্জন মনে করি ওঁকে। এর বেশি প্রয়োজন নেই। লাহিড়ীমশাই নিজেই তো আজ বললেন, কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। আমাদেরও কোন প্রশ্ন নেই।

নির্মল সেন তর্কের গন্ধ পেল, বলল, বাহিরটা দেখে মত দেওয়া কি উচিত!

কার ভেতর কে দেখতে পায় বলুন। আমরা অপরের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে যুক্ত হতে যাব কোন্ দুঃখে। আর অনধিকার চর্চা করে নিজেদের প্রীতি নষ্ট করা কি উচিত! বলেই বিপুল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

এই ঘটনার পর বহুবার নির্মল সেন এসেছে ঐ বাংলোতে। আর কোনদিন বেকার বাউণ্ডুলে নিয়ে মাথায় ঘামায়নি। কণা মজুমদার সম্বন্ধে আগ্রহও দেখায়নি। নির্মল সেন যা জেনেছে তার বেশি কেউ জানেনি। আট-দশ বছর ধরে একই ইতিহাসের পুনাবৃত্তি ঘটেছে। অধ্যাপক-মণ্ডলীতেও অনেক রদবদল হয়েছে। কেউ বদলি হয়েছে, কেউ অবসর নিয়েছে। আবার নতুন অধ্যাপক এসেছে, তারাও ধীরে ধীরে এই আসরে জমায়েত হয়েছে। তারাও প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরেছে।

সমর সরকার আইন সভায় জায়গা করে নিয়েছে, নীতিশ কোন কালেই বাক্যবাগীশ নয়, সে শহরের শেষ প্রান্তে চাষের খেত করে সারাদিন কাটায়। অমলেন্দু এলে সেও আগের মতই আসা-যাওয়া করে। মোটামুটি ধারাবাহিক জীবনে কোথাও ছেদ পড়েনি।

বর্ষায় আর শীতে অমলেন্দু যথারীতি আসে ঐ শহরে। প্লেন থেকে নেমে সোজা চলে যায় তার বাসস্থানে। নেমতন্ন করে তার পরিচিত জনদের। আবার উৎসব মুখর হয় তার বাসস্থান, আবার লোকজনের যাতায়াত আরম্ভ হয়, হাসির হুল্লোর ওঠে, গল্পের ঝর্ণা তর্-তর্ করে বেয়ে চলে। আগের মতই হাসিখুশি ভাবে অতিথিদের সুখ সুবিধার তদারক করে অমলেন্দু। কোথাও কোন ত্রুটি ঘটতে দেয় না সে। যৌবনের

ফেলে আসা রঙ্গীন মনটাকে আবার সতেজ করে তোলে জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

অকস্মাৎ ব্যতিক্রম ঘটল। শীতকালে যে সময় অমলেন্দু আসে সে সময় পেরিয়ে গেছে এবার। অধ্যাপকদের দল নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে, কেন অমলেন্দু আসছে না। হয়ত তার অসুখ হয়েছে, না হয় কোন accident. সবাই জল্পনা কল্পনা করে, স্থির সিদ্ধান্তে কেউ আসতে পারে না। পুরাতন অধ্যাপকদের মধ্যে রয়েছে শুধু নির্মল সেন। কেউ বদলি হয়েছে, কেউ অবসর নিয়েছে। এবার পুজার পর বিপুলবাবুও অবসর নেবে। সবাই অমলেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ট কিন্তু সেই দিনের সেই কাহিনীর একমাত্র সাক্ষী নির্মল সেন। আর সবাই রাজনীতি, সমাজনীতি আর অর্থনীতির কচকচানি করেই ক্ষান্ত থেকেছে।

সেই পুরানো দিনের কাহিনী নির্মল সেন নন্দিতাকে বলেছিল। নন্দিতা জোর দিয়ে বলেছিল, এ কাহিনীর নায়ক ঐ অমলেন্দু লাহিড়ী। হয়ত তাই! সংশয় থেকেছে নির্মল সেনের মনে।

সব চিন্তা ভাবনা ভেদ করে সহসা একদিন কলেজের শিক্ষকদের বিশ্রামঘরে এসে দাঁড়াল একজন ভদ্রমহিলা। বয়সটা অনুমান করতে পারা যায়। স্থির বলা সম্ভব নয়। দেহ সৌষ্ঠবে সুন্দরী পদবাচ্য। এসেই জিজ্ঞাসা করল, বিপুলবাবু আছেন?

অল্প বয়েসি একজন অধ্যাপক মুখ তুলে দেখল মহিলাটিকে। নিরসকণ্ঠে বলল, ছুটিতে আছেন।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করল, নির্মলবাবু?

ক্লাশে গেছেন, বসুন। এখুনি আসবেন।

ভদ্রমহিলা চেয়ার টেনে বসলেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের পেয়ারা গাছের দিকে। একটা কাক পেয়ারা গাছে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, অনিমেষ নয়নে তারই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল ভদ্রমহিলাটি।

এই যে নির্মলবাবু, বলল তরুণ অধ্যাপক। ইনি আপনাকে খুঁজছেন।

ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

আপনি আমাকে খুঁজছেন! নির্মল সেন মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে হাঁ।

কি দরকার বলুন। আপনাকে—,

চিনতে পারেননি। পারবেনই বা কি করে। কখনও দেখেননি তো। আমি কণা মজুমদার।

স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এসে দাঁড়ালেও নির্মল সেন অত আশ্চর্য হত না। বিস্মিত ভাবে কণার মুখের দিকে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না। বসতে বলার ভদ্রতা জ্ঞানটাও যেন লোপ পেয়ে গেল।

অবস্থাটা বুঝতে বিলম্ব ঘটল না কণার। মৃদু হেসে বলল, আশ্চর্য হয়ে গেছেন দেখছি!

বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে নির্মল সেন বলল, সত্যি-ই!

আমার বাড়ির location-টা জানতে এসেছি। রিক্সাওলাকে বলে দিন, কোথায় নিয়ে যাবে।

অমলবাবু আসেননি?

না। তাঁর জন্যই অপেক্ষা করতে হবে। শীগ্‌গীররই আসবেন আশা করছি।

নির্মল সেন এগিয়ে গেল। রিক্সাওলাকে নির্দেশ দিয়ে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, অমলবাবু আপনার কে হন?

কণা হেসে বলল, কে হন না বলুন?

বলতে বলতে কণা রিক্সায় উঠল। মুখ ফিরিয়ে বলল, ওঁর কাছেই আপনার নাম শুনেছি, নইলে বাড়ি খোঁজার মাশুল ভালভাবেই দিতে হত। আচ্ছা আসি। বিকেলে আসবেন সদলে। নমস্কার।

রিক্সা লন পেরিয়ে রাস্তা ধরল।

নির্মল সেন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। এতদিনে কণা মজুমদারের রহস্যের জট যেন খুলে গেল তার চোখের সামনে। নির্মল সেন নতুন জগতের সাথে পরিচিত হল।

অক্ষয় রসায়নের অধ্যাপক। নির্মল সেনকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি দাদা, অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

কণা মজুমদার।

কে? কোথায়? বিস্মিত প্রশ্ন অক্ষয়ের।

যে মহিলা এক্ষুনি রিক্সায় করে গেলেন, তিনি।

বলেন কি। দেখতে হত ভাল করে।

অসুবিধা নেই। বিকেলবেলায় তার ওখানে নেমতন্ন রয়েছে। বলেই নির্মল সেন ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় এসে বসল।

দুই

কণার আমন্ত্রণে কতটা আন্তরিকতা ছিল তা বুঝতে পারল না নির্মল সেন। বিকেলবেলাটা ভেবেই কাটাল। যেতে পারল না ঐ অতি পরিচিত বাংলোয়। কেমন একটা লাজুকতা তাকে পেয়ে বসল, কিছুতেই সে যেতে পারল না। এই লাজুকতা অহেতুক তা বুঝল পরদিন কলেজে এসে। কণার ছোট্ট স্লিপ নিয়ে বাংলোর চাকর অভিরাম এসে নমস্কার করতেই সচেতন হয়ে উঠল নির্মল সেন। জিজ্ঞেস করল, কি খবর অভিরাম ?

মা চিঠি দিয়েছেন, বলেই কণার স্লিপখানা এগিয়ে দিল নির্মল সেনকে। খুব স্পষ্ট পরিষ্কার হস্তাক্ষরে ইংরেজিতে লেখা—Dear Sri Sen, yesterday I expected you. Please don't miss this day—Kana. চিঠিখানা দিয়েই অভিরাম চলে যাচ্ছিলেন। নির্মল সেন ডাকল তাকে, জিজ্ঞেস করল, তোমার এই মাকে চিনতে তুমি ?

অভিরাম একগাল হেসে বলল, মায়ের কাছ থেকেই তো এসেছিলাম।

কোনদিন বলনি তো।

অভিরাম মৃদু হেসে বলল, দরকার হয়নি। তার ওপর বাবুর নিষেধ ছিল।

তা হলে ইনি তোমার বাবুর স্ত্রী।

অভিরাম মাথা নাড়ল, হাঁ-না বোঝা গেল না।

আচ্ছা যাও। তোমার মাকে বল, বিকেলবেলায় যাব।

অভিরাম চলে যেতেই নির্মল সেনের মুখ দিয়ে বের হল, অদ্ভুদ ! গত দশ বছরে একটা লোকও জানতে পারেনি, অমলেন্দু আর কণার সম্পর্ক। আজ অভিরাম যেন যবনিকার ওপর আলোকপাত করল। বয়সের বিচারে কণা অমলেন্দুর স্ত্রী না হয়ে মেয়ে হলেই বেশি মানাত। অমলেন্দুর সেই বাস্তব কাহিনীর দীপক কি সে স্বয়ং এবং কণাই কি সীমিতা ! কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

কলেজ থেকে বেরিয়ে সোজা সে নদীর পাশের পথ ধরল।

শীতটা কমে এসেছে। কণা বাংলোর বারান্দায় বসে বিকেলের পড়ন্ত বেলায় একখানা বই পড়ছিল। মাঝে মাঝে তোর্সার প্রচণ্ড স্রোতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তারিফ করছিল অমলেন্দুর অবসর যাপনের স্থান নির্বাচন চাক্ষুস করে। নির্মল সেনকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। সহাস্যে নিচে নেমে এসে বলল, তা হলে দয়া করেছেন!

নির্মল সেন সহাস্যেই বলল, কার দয়া বুঝতে পারছি না। দয়া করে আপনি ডেকেছেন, সেটা ভুললে যে মহাপাপ হবে।

এবার ঘরে বসে পাপ মুক্তি ঘটান।

অতি পরিচিত ঘরে এসে বসল নির্মল সেন। মুখোমুখি বসল কণা।

অমলের আরও বন্ধুবান্ধব রয়েছে নিশ্চয়ই। তাদের তো আমি চিনি না। আমার হয়ে কালকে তাদের নেমতন্ন যদি করতে পারতেন তা হলে আবার উৎসবমুখর হত এই বাড়ি। স্মিতহাস্যে বলল কণা।

আমার কথায় আসবেন কি তাঁরা?

তা হলে তাদের লিষ্ট দিন। আমি নেমতন্ন পত্র পাঠাব অভিরামের হাতে। আশা করছি, ওঁরা পদধূলি দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন।

আপনি এত বিনীত ভাবে কথা বলছেন কেন? যাদের আসবার তারা আপনার পত্র পেলেই আসবে। তাদের নাম ঠিকানা অভিরাম ভাল করে জানে।

তা বটে। বলে কণা উঠে গেল।

নির্মল সেন কেমন অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদেই কণা চায়ের ট্রে হাতে করে এসে ঢুকতেই নির্মল সেন বলল, আপনি যেন বেশি ব্যস্ত হয়েছেন। অভিরামকে বললেই সেই তো সব করতে পারত।

আপনি অমলের বন্ধু, দ্বিতীয়ত অতিথি। আপনার সেবা আমার ধর্ম।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নির্মল সেন মৃদুস্বরে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি!

নিশ্চয়।

দরজার সামনে নেমপ্লেট দেখে আপনাকে দেখবার ও জানবার অদম্য স্পৃহা ছিল আমাদের মনে। গত আট-দশ বছর মনে মনে আপনাকে খুঁজেছি। কল্পনায় একটা মানুষের চেহারাও তৈরি করেছিলাম।

কণা হাসল। এ হাসির সাথে নির্মল সেন মোটেই পরিচিত নয়। হাসির তলায় যে রহস্য তা কেবল অনুভব করল কণা, বলল, কল্পনার সেই মানুষটা উপে গেছে বুঝি।

ঠিক তা নয়। এই দুরন্ত পাগলানদী তোর্সার মত কেমন একটা ভাঙ্গাগড়ার নেশা দিল মনে। আপনাকে দেখে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। জুলিয়াস সিজারের মত আপনি এলেন দেখলেন জয় করলেন। তবুও মনে হয় আপনাকে দেখলাম, দেখে এখনও বিশ্লেষণ করতে পারিনি। আপনাকে জানবার কেমন একটা অদম্য ইচ্ছা রয়েছে মনে। অবশ্য তা অহেতুক অনধিকার চর্চা। তবুও ইচ্ছেটা রয়েই গেছে।

অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করেননি কখনও? এই ইচ্ছাপূর্ণ করার দায়িত্বটা ওর কাঁধে তুলে দিতে পারতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিনি। যারা করেছে তারা সদুত্তর পায়নি।

কণা খিলখিল করে হেসে উঠল. বলল, কণা is a history herself and a myth too.

বুঝলাম না।

আজ বুঝে কাজ নেই। আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি। কাল সবাই যখন আসবেন তখন আলোচনা করব। জানতে চাইব আমার কি করণীয়। কেমন?—কাল শ্রীমতীকে সঙ্গে করেই আসবেন।

নিশ্চয় আসব।

ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে নির্মল সেন উঠে দাঁড়াল।

অনেকটা রাত হয়েছে। আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

নমস্কার।

কণা নির্মল সেনের সঙ্গে সদর দরজা অবধি এগিয়ে এসে বিদায় জানাল।

কণা ভাল করে চেয়ার টেনে বসল।

সামনে সমর সরকার, নীতিশ আর সস্ত্রীক নির্মল সেন।

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হল অভিরাম। কণা চা তৈরি করে এগিয়ে দিল। বলল, আজ রাতে না খেয়ে কেউ যেতে পাবেন না কিন্তু।

অগত্যা। উত্তর দিল সমর সরকার।

পরিচয় পর্ব শেষ। এবার কণা বলল: যে ধাঁধা নিয়ে এতগুলো বছর আপনাদের কেটেছে, যার জবাব দিতে পারত অমলেন্দু অথচ দেয়নি, তারই যবনিকা উত্তোলন করব। তবে একদিনে তা হবে না। আরব্য উপন্যাসের শাহারজাদীর মত রাতের পর রাত সেই ধাঁধার আবরণ খুলতে হবে, শুনতে হবে ধৈর্য ধরে।

শিবনাথ ছিলেন অতি সুপুরুষ। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গায়ের রঙ, তেমনি চেহারা। রাজা মহারাজার ঘরে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল তার। গরীব কেরাণি-পুত্রের রূপ যদি রূপোর সঙ্গে মিতালি করতে না পারে, সে রূপ কুরূপেই পরিণত হয়। শিবনাথের তাই হয়েছিল। তার বাহিরটা ছিল জৌলুসভরা, সেই জৌলুস দিয়ে অন্তরের কালিমা ঢাকবার চেষ্টা করেছে বার বার এবং বরাবরই তার কদর্যতা ফুটে বেরিয়েছে বাহিরে। সেই কদর্যতার নগ্নরূপ যারা দেখেছে তারা আতঙ্কে শিউরে উঠেছে।

শিবনাথ একক নয়। তার দোসর হল তার যমজভাই রাধানাথ। শিবনাথের সাথে তাকে বদল দেওয়া যেত। গড়নে, উচ্চতায়, মুখশ্রীতে দুজন ছিল একইরকম। রাধানাথের কানের কাছে ছিল কালো জন্মদাগ, নইলে দু'জনকে আলাদা করে চিনে উঠাই ছিল মুস্কিল।

বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ অতিক্রম করল শিবনাথ। রাধানাথ হোঁচট খেল সেখানে।

শিবনাথকে নামতে হল অর্থ উপার্জনের ধান্দায়। ঘুরতে লাগল দরজায় দরজায়। ক্রমেই তার মনে হতে লাগল, চাকুরিলাভ ও ঈশ্বরলাভ প্রায় একই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে। পায়ের জুতো ছিঁড়ল, গায়ের জামা ময়লা হল, দেহ ক্রমাগত ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ল, শুধু সংগ্রহ হল না বাঙ্গালীর জীবনে সবচেয়ে প্রার্থিত বস্তু—একটি চেয়ারে বসবার চাকরি। বেতন তার যাই হোক।

অতর্কিতে ঈশ্বরলাভের মত বস্তু তার কাছে সহজলভ্য মনে হল। রণদামামা বেজে উঠল য়ুরোপে, ছড়িয়ে পড়ল তার ধাক্কা সমগ্র বিশ্বে।

বেকার মানুষের দল ছুটে চলল হত্যালীলায় অংশ গ্রহণ করতে, আরেক দল মেতে উঠল ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করতে। টাকার বাজারে দেখা দিল নতুন চেতনা ও অস্থিরতা,—মুদ্রাস্ফীতি আর কালোবাজারী। শিবনাথ সুযোগ সন্ধানী। হাতে স্বর্গলাভ করল।

দি গ্রেট ওরিয়েন্টাল ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

নতুন পত্তন হল শহরে। দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠল আরও হাজারো প্রতিষ্ঠান।

শিবনাথের কর্মসংস্থান হল এই ব্যাংকের কাউন্টারে। এত দিনের অধীত বিদ্যা অকেজো মনে হল ব্যাংকের কাউন্টারে বসে যখন মুদ্রাস্ফীতি আর কালোবাজারের চেহারা দেখতে পেল।

প্রথম মাসের বেতন একশত টাকা এনে পিতৃহস্তে প্রদান করে শিবনাথ প্রণাম করল। পিতা ভবনাথ সারাজীবন চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেছে। সরকারি পেনশনের চল্লিশ টাকা বাদে আর কোন জীবিকার সংস্থান ছিল না। পুত্রের এই উপার্জনে খুশি হল, আশীর্বাদ করল, শুভায় ভবতু। শিবনাথকে ডেকে বলল, তোর তো কিছু হল শিবু, রাধুর একটা ব্যবস্থাও দেখ। ও যদি কিছু আনতে পারত তাহলে যে জমিটা কিনে রেখেছি, তাতে মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই করতে পারতাম। সারাজীবন বাড়িভাড়া দিয়েই কেটে গেল, শেষ জীবনে নিজের একটা আস্তানা যদি করতে পারতাম! কথায় বলে, পর ভাতি হও, পর ঘরি না হও। পরের ঘরে একমুঠো ভাত খাওয়া যায়, পরের ঘরে থাকা যায় না।

শিবনাথ পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিল, অতি শীঘ্রই রাধানাথের ব্যবস্থা যাতে হয় সে দিকে সে নজর রাখবে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বিশেষ বিলম্ব ঘটেনি। তিনমাস পরে রাধানাথ একই ব্যাঙ্কের কাউন্টারে কাজ পেল। শিবনাথ ও রাধানাথ সমবেতনে নিযুক্ত হল।

শিবনাথ ও রাধানাথের মনোহারি চেহারাই তাদের এগিয়ে চলবার পথ খুলে দিল। উভয়েই তীক্ষ্মধী। অচিরেই শিবনাথ ও রাধানাথ বুঝল, পরের পয়সায় বড়লোকি করবার একমাত্র উপায় হল ব্যাংক পরিচালনা করা। ঘরের কড়ি না দিয়েও জীবনের সব কিছু পেতে হলে যে কোন ব্যাঙ্কের মাথায় গিয়ে বসা দরকার। কোন প্রকারে কোন

ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব হস্তগত করতে পারলে, ঢেলে সাজাতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। বাজারে কালো টাকার অভাব নেই, কালোবাজারীদের টাকার কিছু অংশ গুছিয়ে নিতে পারলে ব্যাঙ্ক হয়ত বেঁচে যেতে পারে। বাঁচুক আর না বাঁচুক, বর্তমানে নিজেরা বাঁচতে চায়।

শিবনাথ যা ভাবে তা সহজে প্রকাশ করে না। রাধানাথ যা ভাবে তা প্রকাশ ক'রে ফেলে। দুজনেই যখন আলোচনা করে পথ স্থির করল তখন রাধানাথ হল অগ্রগামী। সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগল, কোথায়, কিভাবে তাদের কাজ করা সম্ভব। সুযোগও এল। শিবনাথকে ডেকে বলল, শোন দাদা, বড় মাসুন্দা লোন কোম্পানি ডুবে আছে অনেক কাল। আয়ও নেই, ব্যয়ও নেই। সরকারি খাতায় বছর শেষে রিটার্ণ দিয়েই খালাস। যে লোকটা নাড়াচাড়া করছে, তার হাতে কিছু তুলে দিলেই ম্যানেজমেন্ট আমরা পেতে পারি। এখন তো নতুন ব্যাঙ্কের পত্তন করা বন্ধ, আমরা রাতারাতি নাম পাল্টে নিতে যদি পারি তা হলেই কাজ হাসিল।

শিবনাথ মাথা চুলকে বলল, কত দিতে হবে হাতে তুলে ?

হাজার তিনেক।

অত টাকা পাব কোথায় ?

তা ম্যানেজ করা যায় যদি তুই রাজি হয়ে কিছুটা চার্জ নিস।

পাওয়ার রাস্তা যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। অ-রাজি কেন হব !

রাধানাথ ফিস্ ফিস্ করে কানের কাছে মুখ রেখে যা বলল তার গলিতার্থ হল : মিস্ চক্রবর্তী অনেকদিন থেকে রাধানাথের পেছন ধরেছে, তাকে ফুসলে ফাসলে গয়নাগুলো সে হস্তগত করবে। আর শিবনাথের সাথে মিসেস্ দত্তের যা ঘনিষ্ঠতা, সে যদি ইচ্ছা করে বাকি টাকাটা মিসেস্ দত্তের কাছেই পাওয়া যায়। মিস্টার দত্ত এখন ঈজিপ্টে, মাসের য়্যালট্‌মেন্ট্ বেশ ভালই। তারপর মিসেস্ দত্তের হাতে নগদও আছে কিছু, শিবনাথ একটা চান্স নিতে পারে। তবে কাউকেই তারা ফাঁকি দিতে চায় না, সময়মত সব টাকা শুধে দেব।

শিবনাথের কাছে পথটা খুব সহজ মনে হল না। মিসেস্ দত্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ট ঠিকই, কিন্তু টাকা লেনদেন এই ঘনিষ্ঠতার মূল্যই বা

কতটুকু। শিবনাথ মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। মিস্ চক্রবর্তীর গয়না আর মিসেস্ দত্তের টাকা — এদুটো পাওয়া খুব সহজ হবে না। অন্য কোথাও ধার পাওয়া যায় কিনা দেখ।

রাধানাথ বিরক্তির সাথে বলল, ধার দেবে কে? কি দেখে দেবে। আছে তো আমাদের কচু। তোর সব কিছুতেই কিন্তু-কিন্তু। ভাল কাজ করতে গেলে অনেক বিঘ্ন; তা বলে চেষ্টা করা হবে না কি? চিরকালই পেটভাতায় বলব, দুবেলা পেট ভরে খেতে চাইব কিনা! No risk no gain.—চেষ্টা করে দেখি।

চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। তবে সফল হব কি?—বলেই তখনকার মত শিবনাথ প্রসঙ্গ চাপা দিল কিন্তু আশা ছাড়ল না। শিবনাথ রাধানাথ নেমে পড়ল কাজে।

দুজন তাদের লক্ষ্যবস্তুর দিকে শিকারী বেড়ালের মত নজর রাখল। সুযোগ পেলেই লাফিয়ে পড়বার অপেক্ষায় রইল দুজনেই; পথের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন পথ খুলে নিতেও খুব দেরি হবে না। এগিয়ে চলল দুজনেই।

রাধানাথকে রোজই বিকেলে দেখা যেত গঙ্গার কিনারায় মিস্ চক্রবর্তীর সঙ্গে। হেসে হেসে গড়িয়ে যেন পড়ত পথ চলতে চলতে। পাশাপাশি বসে সূর্যাস্ত দেখত, সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসত। তাদের গোলাপী মুখের রঙ-ই বলে দিতে পারত তাদের মনের কথা। প্রশ্ন কারও মনে কখনও জাগত না। রাধানাথ খুব সতর্ক লোক, সে জানে লোহা লাল হলেই তাতে আঘাত করতে হয়। সে অপেক্ষা করতে লাগল সুযোগের। অভিনয়দক্ষ রাধানাথের চাতুরীকে সত্য মনে করে সুযোগ সৃষ্টি করল মিস্ চক্রবর্তী নিজেই।

অফিস ছিল বন্ধ। পূর্ব প্রোগ্রাম মত মিস্ চক্রবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিল। রাধানাথ আজ বিলম্বিত। মিস্ চক্রবর্তী বসে বসে নদীর ঢেউয়ের উথালি-পাথালি দেখছিল, মাঝে মাঝে দূরের স্টীমারগুলোর যাত্রাপথের ঢেউয়ের বাহার দেখতে দেখতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছিল। মাঝে মাঝে হাতঘড়ি দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে উঠছিল।

বিলম্বে এল রাধানাথ।

মিস্ চক্রবর্তী বলল, এত দেরি যে?

গৃহকর্মও তো আছে?

গৃহ বলতে তুমি, কর্ম বলতেও তুমি। গৃহ হোক, তারপর কর্ম নিয়ে মাথা ঘামিও।

মাথা আর ঘামাতে হবে না। পেটে আঁচল বেঁধে থাকতে থাকতেই মাথার ঘাম শুকিয়ে যাবে।

মানে! কৃত্রিম কোপে উত্তর দিল মিস্ চক্রবর্তী, নিজে চাকরি করছ, আর যদি তোমার মিসেস্ও চাকরি করেন তা হলে আর দেখতে হবে কি। পেটে আঁচল বেঁধে থাকতে হবে না মোটেই। দুজনের আয়ে সুন্দর চলবে তোমার সংসার।

তা বটে। স্ত্রীর ওপর নির্ভর করেই আমাকে বিয়ে করতে হবে! এটাই আমার সৌভাগ্য—নয়কি?

দুজনে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবে। তাকে সৌভাগ্যও বলতে পার। ক'জনের ভাগ্যে তা জোটে।

তা বটে। তবে মেয়েরা যদি সংসার ধর্ম করে তাহলে আর কিছু না হোক সন্তান-সন্ততি মানুষ হয়। তা যদি করতে হয় তা হলে নিজের উপার্জন বৃদ্ধির প্রয়োজন। একটা প্ল্যান ছিল। যাক্ ওসব কথা। তিরিশ মন ঘিও পুড়বে না রাধাও নাচবে না। এই তো বেশ আছি।

আছ, তবে বেশ নয়। তার চেয়ে তোমার প্ল্যানটাই বাতলাও।

রাধানাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য সহকারে বলল, দরকার নেই পাঁচ কান করে। মেয়েদের কানে গেলেই সব পণ্ড। যা হবার নয় তা নিয়ে আলোচনা বৃথা।

আবেগের সাথে মিস্ চক্রবর্তী বলল, বলই না লক্ষ্মীটি। আমিও তো তোমার কাজ কিছুটা করে দিতে পারি। সাগর বাঁধতে নেউলের দরকারও তো হয়েছিল।

সে অনেক টাকার ব্যাপার। বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাধানাথ!

টাকার ব্যাপার। কম-সম হলে আমিও তোমার প্ল্যানটা ভেবে দেখতাম।

এই যে ব্যাঙ্ক দেখছ, এর মালিক কে? জনসাধারণ, যাদের টাকা খাটছে

তারা মালিক নয় অথচ লাভের অংশ ঘরে তুলে বড়লোকি করছে ব্যাঙ্কের কর্তারা।

তাতে তোমার কি। যার যেমন ভাগ্য সে তেমন ফল পাবে।

সেই ভাগ্য তৈরি করতে পারতাম যদি দেখে শুনে একটা ব্যাঙ্ক করতে পারতাম। তা হলে ঘুরে যেত জীবনের মোড়। চেষ্টা যে না করছি তা নয় কিন্তু পয়সার অভাবে এগোতে পারছি না। পাঁচ সাত হাজার টাকা কোথায় পাই বল দেখি! তাই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাধানাথ।

মিস্ চক্রবর্তী পাঁচ সাত হাজার টাকার অংকটা বোধহয় মনে মনে হিসাব করছিল। রাধানাথ হতাশার সুরে বলল, শিবুদা উঠেপড়ে লেগেছে। এর মধ্যেই প্রায় তিন হাজার টাকা জোগাড় করেছে। বাকিটাও সে পাবে মিসেস্ দত্তের কাছ থেকে। সব কিছু আমিই করলাম, শেষ অবধি ভোগে লাগল না। শিবুদাই সব পাবে মনে হচ্ছে। তবে সে কথা দিয়েছে, হাজার দেড়েক টাকা দিলে আমাকে জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেকটার করে নেবে। সে টাকাই বা কোথায়!

মিস্ চক্রবর্তী দৃঢ়তার সাথে বলল, আমি দেব।

তুমি দেবে! যদি ফেরত দিতে না পারি।

কোন দুঃখ নেই, ভালবেসে দিয়েছি, ভালবেসেই হারিয়েছি,—এর বেশি তো নয়!

রাধানাথ মানসিক উল্লাস গোপন করে অতি ভাল মানুষের মত বলল, টাকা পয়সার ব্যাপার। ওতে মনোমালিন্য ঘটে। তার চেয়ে আমাদের সৌহৃদ্য অটুট থাকুক।

ব্যস্তভাবে মিস্ চক্রবর্তী বলল, ও কথা কেন ভাবছ। তুমি যদি দাঁড়াতে পার তখন আমাকে যেন ভুলে যেও না।

রাধানাথ একগাল হেসে বলল, পাগল! দাঁড়াই আর বসি, তোমাকে এজীবনে ভুলতে পারব না।

সত্যি।

সত্যি! তিন সত্যি! তোমাকে পাশে নিয়ে আমি ছুটব, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করব। সুখ দুঃখ দুজনে সমানে ভাগ করে নেব। বুঝলে!

মিস্ চক্রবর্তী'র বুঝাবুঝি শেষ। পুলকিত যৌবনের শিহরণ মদির

প্রবাহ ছড়িয়ে দিল তার সর্বাঙ্গে। আনন্দের আবেগে রাধানাথের দুটি হাত চেপে ধরে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সেদিন ফিরে গেল দুজনে স্ব-স্ব স্থানে।

রাধানাথ ফিরে এসে শিবনাথকে বলল, সাকসেসফুল। তোর খবর কি ?

শিবনাথ ঢোক গিলে বলল, একেবারে ফুল !

এখনও বলিসনি বুঝি ? স্টুবিড্। আমি হলে কাজ উদ্ধার করে ফেলতাম কোনকালে। আবার chance নে। মিস্ চক্রবর্তী নগদ কিছু দেবে মনে হচ্ছে, যদি শেষ পর্যন্ত তুই না পারিস তা হলে ওর গয়নাতেই হাত দিতে হবে।

শিবনাথ কুন্ঠিত ভাবে বলল, একটু ধীরে। আমাকে আরও একটু সময় দে। আমিও দেখি। বলতে পারলে আদায় হবে নিশ্চয়ই। বলতেই পারছি না, কেমন সঙ্কোচ অনুভব করছি।

রাধানাথ উৎসাহ দিয়ে বলল, তোকে বলতেই হবে। ও রকম শাঁসালো মাল পেলে কোনদিন হজম করে দিতাম। হাঁ। ও আবার একটা কাজ। একটু অভিনয় দরকার। নিজে নিজে ট্রেনিংটা নিয়ে নে।

শিবনাথ মন শক্ত করে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। সোজা উঠল মিসেস্ দত্তের বাড়িতে।

সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে কি ভাবে প্রস্তাব করা যায়। রাধানাথ আগাগোড়া যে ভাবে ভালবাসার অভিনয় করেছে, শিবনাথের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সে সত্যিই মিসেস্ দত্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা এত দূর এগিয়েছিল যে ধোঁকা দিয়ে অর্থ আদায় করতে তার বিবেক বাধা দিচ্ছিল। মিসেস্ দত্তের কাছ থেকে একহাজার টাকা নেওয়া সম্ভব কিন্তু তা ঠকিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণেই আজ অবধি প্রস্তাব জানাতে সাহস পায়নি। সে ভাল করেই জানে যে ইচ্ছে করলে মিসেস্ দত্ত তিন হাজার টাকাই দিতে পারে। সব জেনেও সে বলতে পারেনি। কেন না এ পর্যন্ত সে ভালবাসার অভিনয় করতে পারেনি, যা রাধানাথ পেরেছে।

আজ মনস্থির করেই আসতে হয়েছে। যেমন করে হোক টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। রাধানাথ তাকে টেক্কা দিয়ে যাবে এ সহ্য হচ্ছিল না।

বিশেষ করে রাধানাথ যদি সব টাকা সংগ্রহ করে তা হলে শিবনাথের কর্তৃত্বও কমে যাবে। সমান সমান চলতেই হবে।

শিবনাথ আসতেই মিসেস্ দত্ত আদর আপ্যায়ণে মেতে উঠল কিন্তু শিরনাথ সেই যে মুখ ভার করে ঘরে ঢুকেছে তা কিছুতেই বদল হল না। শিবনাথের বিষাদক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে মিসেস্ দত্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি বল দেখি। আজ এত মুখ ভার কেন?

শিবনাথ অন্যমনস্কভাবে বলল, না কিছু না।

মিসেস্ দত্ত মৃদু হেসে বলল, না বললেই হল। আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট নই, বরং দু-এক বছরের বড়ই হব। আমারও কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে। বলতো, বাড়িতে কিছু ঘটেছে কি!

এমন কিছু নয়।

বললেই হল। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বুঝি?

আমার নয়। রিনুর, আমার বোনের।

তাতে তোমার কি। রিনুর বিয়ে হবে, ঘর পাবে, সংসার পাবে। সুখের কথা। তোমার মুখে মেঘ কেন! তোমার বিয়ে আমি হতেই দেব না। যেমন করে পারি বাগ্‌ড়া দেব। আর মুখ কালো করে থেক না।

বুঝতেই পারছ টাকার দরকার। বাবার অবস্থা তো জান। আমাদের আয়-ই বা কত।

টাকা! হায়, হায়! টাকার দরকার। তারজন্য এত ভাবনা। কত টাকা?

তা দেড়-দু হাজার হবে।

মিসেস্ দত্ত ফিক্ ফিক্ করে হেসে বলল, দেড়-দু হাজার টাকার জন্য আজকের রাতটাই মাটি করবে দেখছি। ও টাকা আমি দেব। তুমি মুখ ভার করে থেক না। ওতে আমি বড় কষ্ট পাই।

তুমি দেবে। আনন্দের আবেগে বলল শিবনাথ।

নিশ্চয়। তবে একটি promise করতে হবে।

আগ্রহ সহকারে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করল, কি promise?

এ জীবনে শিবনাথের হৃদয়ে অন্যের স্থান হবে না। শিবনাথের হৃদয়ে স্থায়ী আসন রইবে অনিমা দত্তের। পারবে এই promise করতে?

নিশ্চয় পারব। আমি promise করছি।

সে রাতে শিবনাথ ফিরে আসেনি তার বাড়িতে। পরদিন সকালবেলায় দু হাজার টাকার চেক হাতে করে হাসি মুখে ফিরে এসে রাধানাথকে বলল, এই নে দু হাজার। —তোর টাকার কি ব্যবস্থা ?

রাধানাথ সলজ্জভঙ্গীতে বলল, দে ওটা, বিকেলে আমার টাকাও পাবি। cheque নয় cash, বুঝলি।

নিত্যকার রুটিন মত দুজনই অফিসে বেরিয়ে পড়ল।

বিকেলবেলার অপেক্ষায় আর থাকতে হয়নি। অফিসে গিয়েই মিস্ চক্রবর্তীকে সংগোপনে ডেকে বলল, এই দেখ, শিবুদা সংগ্রহ করেছে টাকা। আমি-ই পেছনে পড়ে রইলাম। কি করি বলতো !

মিস্ চক্রবর্তী ব্যাগ খুলে পনরখানা একশত টাকার নোট রাধানাথের হাতে দিয়ে বলল, এবার হল তো। প্রতিশ্রুতি যেন ঠিক থাকে। সুখে-দুঃখে একসাথে রইব দুজনায়, মনে থাকে যেন !

টাকাটা পকেটে ফেলে রাধানাথ বলল, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

শিবনাথ ও রাধানাথ নেমে এল কর্মক্ষেত্রে।

এক মাসও পেরোল না। চীনা বাজারের এক গলিতে নতুন ব্যাঙ্কের সাইন বোর্ড দেখা গেল 'দি ব্যাঙ্ক অব্ ইস্ট্ এশিয়া লিমিটেড্।' দারোয়ান উর্দি পড়ে দাঁড়িয়ে দরজায়। কাউন্টারে খরিদ্দারের ভিড় না থাকলেও কর্মচারিদের ভিড় রয়েছে ভেতরে। চেম্বারে চেম্বারে অফিসার। কেউ ম্যানেজার, কেউ চিফ্ এ্যাকাউন্টেন্ট। বড় বড় খাতায় কাগজে আলমারি ভর্তি।

ব্যাংক নিয়ে মেতে উঠল শিবনাথ ও রাধানাথ। সকালে বিকেলে পার্টির বাড়িতে বাড়িতে ছুটছে। ছুটছে গৌহাটি, শিলচর, রংপুর, নীলফামারি ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন করতে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এই ব্যাংকের শাখা প্রশাখা। ব্যাংকের বিশেষ বিভাগে যোগ দিয়েছে মিস্ চক্রবর্তী। চারটের সময় গাড়ি ছুটত দক্ষিণে, সেখান থেকে আসত মিসেস্ দত্ত। শিবনাথ রওনা হত তার সাথে আর রাধানাথের গাড়িতে উঠে বসত মিস্ চক্রবর্তী। জীবনের সব মধু আহরণ করতে সবাই ব্যস্ত, কেউ কারও চেয়ে পেছনে পড়ে নেই।

যে ব্যবসায়ের মূলধন থাকে না, শুধু থাকে ব্যয়, সে ব্যবসায়ের

পরমায়ু হয় অতি ক্ষীণ। একথা শিবনাথ ও রাধানাথ ভালভাবে জানে, তাই আমদানীকৃত অপরের অর্থ যাতে সম্পত্তি লাভ করে তার জন্য অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও বুদ্ধিব্যয় করত। সঙ্গিনীর দেহে অলঙ্কারের প্রাচুর্য যেমন ঘটল তেমনি জুটল বিলাস উপকরণ। সব কিছু গুছিয়ে নেবার আগেই থেমে গেল লড়াই, দেখা দিল বেকার সমস্যা. টাকার বাজারে এল আরও অস্থিরতা। সঞ্চিত টাকা গুটিয়ে নেবার তাগাদা দেখা দিল সর্বত্র।

ঈজিপট্ থেকে ফিরে এল মিস্টার দত্ত। সর্বত্রই ভাঙ্গনের লক্ষণ ভালভাবে দেখা দিল। অনিমা দত্তের সুখের পরিবেশে দুঃখের কালো মেঘ দেখা দিল। ফিরে এসে পরিবেশকে ভাল করে বুঝতে মিস্টার দত্তের খুব বেশি সময় দরকার হয়নি, দারোয়ানকে নির্দেশ নিল বাইরের কোন লোক এসে মিসেস্ দত্তের সাথে দেখা করতে চাইলে যেন তাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেয়। মনের ক্ষতি আইনের মাদুলি দিয়ে পূরণ করতে চাইল মিস্টার দত্ত।

শিবনাথ প্রস্তুত-ই ছিল। এমন অবস্থা হবে জেনেই পাঁচ বছর আগে গোপনে বিয়ে করেছিল। শাখা পরিদর্শনের নামে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করত। মিসেস দত্ত এই বিয়ের খবর জানতেও পারেনি। শিবনাথের উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাঙ্কের ঐশ্বর্য দেখিয়ে শ্বশুরের কিছু বিত্ত সংগ্রহ, তা সে করেছিল। কাজের অজুহাতে পিতৃগৃহেই স্ত্রীকে স্থায়ী বাসিন্দা করে রেখেছিল, মাসে মাসে মোটা মাসোহারাও পাঠাত।

স্ত্রী মমতাময়ী রূপসী নয়। রূপ বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুমাত্রও ছিল না তার, আর ছিল না নামের মর্যাদারক্ষাকারী মমতানামক গুণটি। অর্থের প্রয়োজনে এবং ভবিষ্যত আশ্রয়ের আশায় শিবনাথ বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর মমতাময়ী স্বামীর ঘরে যেতে ব্যাকুল হলেও সাহস করে শিবনাথ তাকে কলকাতায় আনেনি। মিসেস্ দত্ত যখন আটকে গেল তার গৃহপরিবেশে তখন মমতাময়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল শহরে; সঙ্গে দুইটি শিশু, একটি কন্যা অপরটি পুত্র। মমতাময়ী সংসার পেল, শান্তি পেল না।

স্বামীর ঘর করতে এসেই সংবাদ সংগ্রহ করল তার স্বামীর পূর্বজীবনের। সতর্ক হল সে। স্বামী-স্ত্রীর মানসিক কোন বোঝাপড়া তো হলই না, উপরন্তু যখন ব্যাঙ্কের অবস্থা শঙ্কাজনক তখন শিবনাথ

মমতাময়ীর কিছু অলংকার বন্ধক দিয়ে উৎরে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মমতাময়ী তার অলংকার হস্তচ্যুত করতে রাজি না হওয়াতে শিবনাথ পড়ল ভয়ঙ্কর বিপদে। ব্যাঙ্কের দরজায় পাওনাদারদের হামলা শুরু হল। শিবনাথ বুঝল, তার অসদুপার্জিত অর্থের অন্তিমকাল উপস্থিত। ব্যাঙ্কের সব শাখায় তালাবন্ধ করে শিবনাথ আত্মগোপন করল।

শিবনাথ ভেবেছিল এই সংকটে মিসেস্ দত্ত তাকে সাহায্য করবে কিন্তু কড়া পাহারা ভেদ করে কোনক্রমেই সে মিসেস্ দত্তের সঙ্গে দেখা করতে পারল না। হতাশ হয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিল। সেই বন্ধুও সুযোগ বুঝে শিবনাথের পকেট শূন্য করার ফন্দী খুঁজতে থাকে।

রাধানাথও সতর্ক হল, কিন্তু বুদ্ধির ক্ষেত্রে রাধানাথের বিশেষ খ্যাতি ছিল না। মিস্ চক্রবর্তীর পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দিলেও সাহস করে তার বিপন্ন অবস্থার কথা বলতে পারেনি। তার নিজের দোষেই জড়িয়ে পড়ল বিপদে। ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হতেই মিস্ চক্রবর্তী বাতাসে মিলিয়ে গেল। সুখ-দুঃখের সমান অংশীদারত্ব নেবার আর কেউ রইল না, শিবনাথকেও খুঁজে পেল না ফন্দীফিকির জোগাতে। রাধানাথ খুঁজতে লাগল শাঁসালো শ্বশুর অথবা উপার্জনশীলা মেয়ে। অর্থের সমস্যা এতেই সমাধান হবে ভেবে আরও বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে বিয়ে করল। দায় শোধ হবার চেয়ে দায় বৃদ্ধি পেল। রাধানাথ সংসার প্রতিপালন করতে না পেরে কিস্তীবন্দীতে কেনা মোটর গাড়ির টাকা শোধ হবার আগেই তা বিক্রি করে দিল। আইন হল প্রতিবন্ধক। বিচারে রাধানাথের চার বছরের মেয়াদ হল। পেছনে পড়ে রইল স্ত্রী ও সদ্যজাত পুত্র। শিবনাথ ও রাধানাথের যৌথ অসৎ প্রচেষ্টার পরিণতি কুৎসিতভাবে দেখা দিল। দুজনেরই অবস্থান তখন নেপথ্যে।

সংবাদ শুনে শিবনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসল। রাধানাথের স্ত্রী ও ও পুত্রের দায় নেবার ক্ষমতাও তার ছিল না।

মমতাময়ীর মমতাহীন তীক্ষ্ন কণ্ঠ আক্রমণ করল শিবনাথকে। গৃহে চাল বাড়ন্ত, বাড়িওলার ভাড়ার তাগাদায় চুল ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম, দুধওলা শিশুদের দুধ বন্ধ করে দিল। শিবনাথ চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বন্ধু মানদাচরণের আশ্রয় ভিক্ষা করল। আশ্রয় ও আহারের

প্রয়োজন অনিবার্য এবং তা পূরণ করতে হবে অবিলম্বে। অপরের করুণালাভ করাই একমাত্র উপায়।

বিনীত কণ্ঠে বলল, আমার ব্যবসা নষ্ট হয়েছে পাঁচজনের বুদ্ধিতে। এখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনাহারে মরবার উপক্রম। তুমি বাঁচাও ভাই।

মানদাচরণ অবস্থা উপলব্ধি করে উপদেশ দিল, তুমি তোমার বউছেলে নিয়ে আমার মায়ের কাছে যাও। মাকে বুঝিয়ে বল, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু করবেন। মায়ের অনুমতি ভিন্ন আমি কিছুই করতে পারব না। জানোই তো মা আমাদের সব কিছু।

তিনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন? চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করল শিবনাথ।

নিরুপায়। আমার বিশ্বাস তা তিনি করবেন না। এমনিধারা উনিও একসময় বিপন্ন অবস্থায় লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। উনি সাহায্য করবেন নিশ্চিত। ওঁর কাছে তুমি যদি সাহায্য না পাও অপরে কি করবে তা বলতে পারি না, মনে হয় অপরে সাহায্য করবে না। আমার মায়ের করুণা লাভ সহজ। স্থানটি বোধহয় নির্ভুল।

মানদাচরণের জননী বনলতা আশ্রয় দিল। তার মমত্ব জেগেছিল শিশুদের মুখ চেয়ে।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই শিবনাথ বের হয় কর্মের সন্ধানে। অপরিচিত জনের সঙ্গে পরিচয় করে, পরিচিত জন দেখলে মুখ লুকায়। যুদ্ধের ডামাডোল শেষ, কর্মপ্রাপ্তি মোটেই সহজ নয়। রাজনীতির খরস্রোতে সমগ্র দেশ টলটলায়মান। ইংরেজ চলে যাবে ধুয়া উঠেছে, সেই সঙ্গেই পিঠেভাগের দাঙ্গাও লেগে গেল এদিকে ওদিকে। শহর আর শহরতলী রক্তস্নান করতে থাকে, আর শিবনাথ চুপ করে গৃহকোণে বসে দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। ভাবে আকাশ আর পাতাল, আর আশ্রয় গড়ে মহাশূন্যে। মমতাময়ীর সঙ্গে সাক্ষাত হয় কম, কখনো যদি দেখা হয় তা হলে লেগে যায় সংঘর্ষ। কটুবাক্য বিনিময় হয় সম্বল। তখন দুজনেই ক্ষিপ্তের মত দুজনকে আক্রমণ করে। শিবনাথ ও মমতাময়ী যেন দুটো বারুদের স্তূপ। যে কোন সময় বিস্ফোরণের জন্য তারা যেন প্রস্তুত। সংঘাত হলেই সর্বনাশ।

নতুন জীবনের বাণী বহন করে আনল দেশের নেতারা। দেশ পেল স্বাধীনতা, ইংরেজ ফিরে গেল তাদের দেশে, যাবার সময় জাতীয়তা

বোধের বুনিয়াদে আঘাত দিয়ে ভাগ করল দেশকে। দাঙ্গা বন্ধ, মানুষ নিজ নিজ বৃত্তিতে আবার ফিরে আসতে থাকে, আবার সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। আর সাথে সাথে প্রবল বন্যার স্রোতের মত ছুটে আসতে থাকে আশ্রয়প্রার্থী নরনারী। একে একে দশে দশে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লাখে লাখে। শিবনাথ সুযোগ বুঝে সমাজসেবীর খাতায় নাম লিখিয়ে সাহায্যদাতার দলে গিয়ে ভিড়ল। জনসেবার লভ্যাংশ নগদে নেহাত কম আসত না, সংসারের ছোটখাটো ব্যয় চালিয়েও উদ্বৃত্ত যা থাকত তা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রাদির পোশাক পরিচ্ছদ ভালই চলত। এতে শিবনাথ খুশি নয়, সে আরও চায়, অপরিমিত তার আকাঙ্খা। শিবনাথ পথ খুঁজতে থাকে। সে পথ যতই পিছল হোক, সে যাবেই সেই পথে। শিবনাথ কৃচ্ছ্রতাকে ঘৃণা করে, আর ঘৃণা করে মেহনত করে পয়সা উপায় করতে। যা সে করে তা শুধু সাময়িক! সুযোগ পেলেই স্বমূর্তি ধারণ স্বাভাবিক।

চলছিল ময়দানে। আশ্রয় প্রার্থীদের সভার আয়োজন করতে।

মোহনলাল ছিল তার ব্যাঙ্কের কেরানি। পথে দেখা।

বিনীত ভাবে নমস্কার করে মোহনলাল বলল, কেমন আছেন স্যার।

শিবনাথ মুখ তুলে দেখল তাকে। চিনতে পারল। লজ্জায় কথা বলতে পারল না। শুধু মাথা নাড়ল। অনেকদিন পর দেখা।

তা বটে। কি করছ আজকাল?

ম্যাসেজ ক্লিনিক করেছি স্যার।

শিবনাথ সহসা কিছু বলতে পারল না। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কেমন চলছে?

ভালই। অনেক মেয়ে এসেছে ভাসতে ভাসতে তাদের ক'জনকে সংগ্রহ করে কাজে লাগিয়েছি। আর জানেন তো, একদল লোকের হাতে রয়েছে অফুরন্ত চোরাই পয়সা, তারাই চোরাই পথে এসে হাজির হয়। এতে যা হয় তাতে সব ম্যানেজ করেও দুপয়সা থাকে। মোটামুটি বিজনেসটা ভাল, তবে ঝুঁকি অনেক। পুলিশের হাঙ্গামা, রোয়াকবাজদের হাঙ্গামা, এসব সামলাতে হয়। লাভের গুড় পিঁপড়ে বেশ কিছুটা খেয়ে নেয়।

শিবনাথ স্থির নেত্রে মোহনলালের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কি দেখছেন স্যার?

তোমার ক্লিনিকের আশেপাশে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না ?

তা যায়। কেন স্যার ?

আমার এক বন্ধু বলছিল, একটা ক্লিনিক করবে। ঘর ঠিক করে দিতে পারলে আমারও টুপাইস থাকবে।

বেশ তো। তাকে আসতে বলুন একদিন। এই তো মতিশীল স্ট্রীট দিয়ে ঢুকেই কটা বাড়ি বাদে বাঁ হাতে।

আচ্ছা, বলব তাকে। আমিও আসব তার সাথে। তোমার সাহায্য নিশ্চয়ই পাব।

তা বলতে। বলেই মোহনলাল নিজের পথ ধরল।

শিবনাথ মনে মনে হিসাব করে ঠিক করল, এ ব্যবসা মন্দ নয়। তবে ইকুইপমেন্টের খরচ তো আছে। কি করে সব ম্যানেজ হবে। মানদা-চরণকে একথা বলা যাবে না, বরং তার ছোটভাই প্রাণদাচরণকে বলে দেখলে হয়। সাহায্য তার কাছেই পাওয়া সম্ভব। প্রাণদার দায় দায়িত্ব কম, বেশ বোকাসোকা লোক, ভজাতে পারলে সুবিধা হবে।

প্রাণদাচরণকে গোপনে ডেকে বলল তার প্ল্যান। প্রাণদাচরণ অবিবাহিত যুবক। প্ল্যানে একটা রোমাঞ্চ যে রয়েছে তা ছিল অনস্বীকার্য। সে আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি হল। প্রাণদাচরণ এই নোংরা ব্যবসায় কেন যে টাকা দিতে রাজি হয়েছিল সে কথার উত্তর প্রাণদাচরণ কোনদিনই দিতে পারেনি, বরং পরবর্তীকালে সে লজ্জিত হয়েছিল তার নাম যুক্ত হওয়াতে। সেটা অনেক পরের কথা। মানদাচরণ যখন জানতে পারল তখনই তার পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

আবার সাইনবোর্ড ঝুলল, "সায়েন্টিফিক ম্যাসেজ এন্ড ক্লিনিক হোম"।

মমতাময়ী এই নতুন জীবিকার সব কথা জানলেও শিবনাথকে বাধা দিল না। অনাহারী সন্তান-সন্ততির পেট ভরাতে স্বামীর কার্যক্রমের নৈতিক দিকটা সে ভুলে গেল। শিবনাথ বাসা ভাড়া করে স্ত্রী পুত্রাদি নিয়ে সংসার পাতল। মমতাময়ী জিজ্ঞাসাও করল না, শিবনাথ অত অর্থ কোথায় পায়। নারীদেহের বিপণি সাজিয়ে শিবনাথ শুধু নোংরা পয়সাই উপার্জন করছিল না নিজেকেও নোংরা পথে টেনে নিয়ে চলছিল। এ কার্যের ফল যখন মমতাময়ীর চোখের সামনে স্পষ্ট

উঠল, তখন অনেক বিলম্ব ঘটে গেছে। শুধরে নেবার পথ তখন বন্ধ।

প্রথমে শিবনাথের যাতায়াত কমে গেল। মমতাময়ীর সংসারের খরচেও ধীরে ধীরে টান দেখা দিল। শিবনাথ যাও বা দু'একবার আসা-যাওয়া করত তাও বন্ধ করল। মমতাময়ীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতেইবোধহয় চিরতরে স্ত্রী-পুত্রাদির মায়াত্যাগ করে নতুন সংসারের খোঁজে বের হয়েছিল!

মমতাময়ী অকূল পাথারে হাবুডুবু খেতে লাগল। আবেদন জানাল প্রাণদাচরণের কাছে। সন্তানের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও সে রাজি। প্রাণদাচরণ আশ্বাস দিল, বলল, তোমার ভাবনা আমি ভাবব। তুমি ভাব কি করে তোমার ছেলেমেয়েকে মানুষ করবে। শিবুদাকে ভুলে নতুন করে জীবনের ভাবনা ভাবতে থাক।

মানুষ! মমতাময়ী আঁতকে উঠল। মানুষ করা যদি সহজ হত তা হলে তো বর্তে যেত। মানুষ করার প্রথম পদক্ষেপ প্রতিপালন করা, তাই সে করতে পারেনি, সেখানে মানুষ করার প্রশ্ন অনেক দূরে। তবুও আশ্রয় পেল, আহার্যের দুর্ভাবনা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পেল সে।

মমতাময়ী নিশ্চিন্তেই রইল।

এদিকে শিবনাথ ক্রমেই দূরে সরে গেল। এতদূরে যে নাগালের বাইরে। মমতাময়ী আর শিবনাথের সম্পর্ক সবাই ভুলে যেতে লাগল। শিবনাথ মমতাময়ীর জীবনে হয়ে রইল দুঃস্বপ্ন। ছেলেমেয়েরা কখনো তাদের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে মমতাময়ীর চোখ দুটো জ্বলে উঠত, বলত, তোদের বাবা বেঁচে নেই। আমাদের কাছে সে মৃত।

দুই

বিকেলে বাড়ি ফেরবার পথে প্রাণদাচরণ এল মমতাময়ীর বাড়িতে। মমতাময়ীকে চুপি চুপি বলল, আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?

মমতাময়ী উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল, কেন?

সমরেশ দত্তের নাম শুনেছ, মিসেস্ অনিমা দত্তের স্বামী!

শুনেছি। কি হয়েছে তার ?

আজ সকালে সমরেশ দত্তের মৃতদেহ পাওয়া গেছে তার ঘরে। হত্যাও হতে পারে আত্মহত্যাও হতে পারে।

মমতাময়ী চমকে উঠল। কেমন একটা অজানা ভয়ে বুকটা দুরু-দুরু করতে থাকে। এই মৃত্যুর সাথে শিবনাথের কোন সংযোগ নেই তো ? জানবার কোন উপায় নেই। শিবনাথের মেসেজ হোম পুলিশ ভেঙ্গে দিয়েছে। শিবনাথ বেকার হয়ে আবার পথে পথেই ঘুরছিল। কোনক্রমে সে অনিমা দত্তের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে কোন দুষ্কার্য করেনি তো ? অনিমা দত্তের হাতে অনেক টাকা। শিবনাথের সঙ্গে তার যোগসূত্র, অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ। এ মৃত্যু ? হয়ত হত্যাকাণ্ড ! দুজনের পক্ষেই এই ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন সম্ভব।

মমতাময়ী অস্থির হয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে ডেকে আনল ছেলে আর মেয়েকে। তাদের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির করতে চাইল তাদের পিতার চরিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা ?

মেয়ে বলল, কেন ডাকলে মা ?

চুলটা আঁচড়ে দেব। অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে কোনরকমে দায় শেষ করল। মেয়ের চুলের গোছা নেড়ে চেড়ে বলল, কি ভুতের মত চেহারা হয়েছে। যা হাত মুখ ধুয়ে আয়।

ছেলেকে বলল, সারা বিকেল খেলে বেড়াবি। বাজারটাও তো করতে পারিস।

আট বছরের ছেলে যে বাজার করে আনতে পারে না তা মমতাময়ী ভাল করে জেনেই এ অদ্ভুত কথা বলেছিল। বলবার মত কোন কথাই সে খুঁজে না পেয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরেই বলল, কাল থেকে তোকে বাজার যেতে হবে।

পরদিন সকালবেলায় খবরের কাগজ এনেই মমতাময়ী খুলে বসল। কোথাও সমরেশ দত্তের মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটিত হল কিনা দেখবার জন্য প্রতিটি পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। না, কোথাও নেই। সমরেশ দত্তের সংবাদ জানতে রোজই সে খবর খোঁজে, না পেয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়। এমনি করে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, চাপা পড়ে গেল সমরেশ দত্তের মৃত্যু রহস্য।

রাতের বেলায় মমতাময়ীর মেয়ে পায়খানা থেকে দৌড়ে এসে মমতাময়ীকে জাপটে ধরল।

কিরে খুকি ?

লোক।

কোথায় ?

পায়খানার পেছনে !

লণ্ঠন হাতে করে মমতাময়ী এগিয়ে গেল। না, কেউ নেই। ছিল কেউ নিশ্চয়ই। মমতাময়ীর মেয়ের ভুল হয়নি ঠিকই। কিন্তু কি উদ্দেশ্য। মমতাময়ী সোমত্ত মেয়ের জন্য সতর্ক হল।

পরদিন অফিস ফেরত প্রাণদাচরণ এল দেখা করতে। মমতাময়ী একান্তে ডেকে বলল, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে বাস করা এমনিতেই কঠিন, তার ওপর যদি পুরুষ অভিভাবক না থাকে। কি করি বলত? আমি বলছি, তুমি আমার এখানেই থাকো।

চমকে উঠল প্রাণদাচরণ। বলল, তা কেমন করে হয়।

আমার মেয়ের মান রক্ষাই আমার বড় কাজ। ছেলে এখনও ছোট। তার ওপর।

তার ওপর কি ?

আমাদের খরচ সব তোমাকে টানতে হয়, উপরি তোমার খরচ আছে। দোকর খরচ না করে এক জায়গায় খরচ রাখলে সবারই সুবিধা।

প্রাণদাচরণ একথা অনেক দিন ভেবেছে কিন্তু সমাজব্যবস্থা তাকে সহজে গ্রহণ করবে না তাও সে জানে। ইতস্তত করে বলল, লোকে কি বলবে !

মমতাময়ী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, লোকে অনেক কথাই বলবে কিন্তু তারা তো আমাদের খেতে দেবে না, খেতে পাই এমন কোন ব্যবস্থাও করবে না। কত মা সন্তান বাঁচাতে দেহ বিক্রি করে। আমি অত নিচে নামিনি। আমি চেয়েছি তোমার অভিভাবকত্ব। তার জন্য, বিশেষ করে আত্মরক্ষার জন্য আমি যদি তোমার সাথে ঘরই বাঁধি তাতেই বা অপরাধ কি। মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে নিজেকে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যই যদি স্বামী বদল করি, সন্তানরা নতুন পিতার আশ্রয় পায় তাহলে কারও কিছু বলবার আছে কি !

কি বলছ তুমি! বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল প্রাণদাচরণ।

যা বলছি তা শ্রুতিকটু কিন্তু অসঙ্গত নয়। এই সন্তানদের বড় করবার দায়িত্ব কার? পিতা যেখানে দায়িত্ব পালন করেনি, মা সেখানে চুপ করে বসে থাকতে পারে কি? আমার কপালে কলঙ্করেখা টেনেও ওদের বড় করতে হবে। তুমি এতকাল যে সাহায্য দিয়েছ তা আমি স্মরণ করব কৃতজ্ঞচিত্তে। তুমি দিয়েই এসেছ, পাওনি কিছু। আর মহত্বের বিনিময়ে তুমি পাবে কলঙ্ক। তবুও তোমাকে সহ্য করতে পারব, তোমার অর্থের ঋণ হৃদয়ের সূক্ষ্মবৃত্তিগুলো দিয়ে শোধ দেব। সেই সুযোগ আমাকে দাও। আমি একাধারে মা ও নারী। আমার মাতৃত্বকে রক্ষা করতে নারীত্বকে বধ করতে চাই না। আমি চাই মা ও নারী পাশাপাশি চলুক। তুমিও পিতা না হয়েও পিতার কাজ করছ, জানি না ঈশ্বর আছেন কিনা, যদি থাকেন তা হলে অপরের পাপের যে শাস্তি আমি ভোগ করছি, আমার পাপ সেই তুলনায় ঈশ্বরের দরবারে মার্জনা পাবার যোগ্য। তুমি অমত কর না।

প্রাণদাচরণ মমতাময়ীর কোন যুক্তিই মেনে নিতে পারল না। বলল, আমাকে ক'টা দিন ভাবতে দাও।

প্রাণদাচরণ পড়ল বিপাকে। ঝড় উঠল প্রচণ্ড। শান্তশিষ্ট প্রাণদাচরণ সংসারের দায়িত্ব না নিয়েও সংসারে যেন জড়িয়ে পড়তে লাগল।

প্রাণদাচরণকে আসতে হল মমতাময়ীর গৃহে। নিরুপায় হয়েই আসতে হল। মমতাময়ীর মেয়ে বলল, তুমি দশ বছর ধরে আমাদের পিতার কাজ করছ। তুমি কি চাও আমাকে রাতের অন্ধকারে পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা টেনে নিয়ে যাক। দিনের বেলায় পথ চলতে পারি না, রাতের বেলায় শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে যেতে পারি না। সন্ধ্যার আগেই দরজা বন্ধ করে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাই। তোমাকে থাকতেই হবে এখানে।

এরপর আর বাইরে থাকা উচিত নয় মনে করেই প্রাণদাচরণ আশ্রয় নিল মমতাময়ীর গৃহে। অবশ্য সামান্য আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, কিন্তু মা, লোকে কি বলবে!

লোকে যাই বলুক, তারা তো আমাদের রক্ষা করবে না। আমরা

যা জানব তাই হল ঠিক জানা, অপরের জানার কোন মূল্যই নাই। আমরা জানব, আমাদের একজন রক্ষক রয়েছে, ভক্ষক সে নয়।

তর্কের আর অবকাশ ছিল না। প্রাণদাচরণ হল স্থায়ী বাসিন্দা।

মেয়ে বলল, মা, আমি আর পড়ব না।

কেন? জিজ্ঞাসা করল মমতাময়ী।

স্কুলে নানা প্রশ্ন ওঠে, তাই মনে করছি আর পড়ব না। যা পড়েছি, তাই যথেষ্ট। এবার চাকরি করব।

ম্যাট্রিক পাশ না করলে চাকরি কি করে পাবি!

পাশ না করেও অনেক কাজ পাওয়া যায় মা।

কেমন?

নার্সিং শিখব। সরকার জুনিয়ার নার্সিং ট্রেনিং দেবে। এইট পাশ করলেই চান্স পাওয়া যায়।

নার্সিং। বলিস কি! জানিস তোর বাবার ম্যাসেজ ক্লিনিকে অনেক নার্স ছিল। তারা ছিল অতি নোংরা। এই নোংরামি তুইও চাস।

মেয়ে হেসে বলল, তুমি ভুল করছ মা, ওরা কোনকালেই নার্স নয়। ওরা নোংরা, ওরা নোংরামি করবে বলেই মেসেজ হোমে এসেছিল। নার্স যারা তারা ও জীবিকা কখনো গ্রহণ করবে না।

তবুও ওটা আমার পছন্দ নয়।

তুমি মত দাও মা। তোমার অমতে কিছুই করতে পারব না। কাকাবাবুর মত আমি নেব। তুমি আমাকে মন খুলে সম্মতি দাও। তোমার মেয়ের ওপর তোমার বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আপত্তি কর না।

আচ্ছা ভেবে দেখি। বলে মমতাময়ী তখনকার মত ঘটনা চাপা দিল কিন্তু পরদিন মেয়ে যখন স্কুলে গেল না তখন সে চিন্তিত না হয়ে পারল না। মেয়েকে কাছে ডেকে বসালো। বলল, সত্যিই কি পড়া ছেড়ে দিবি। আর একটা বছর পড়বি না?

আর একদিনও নয়। যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করতে পারি তা হলেই পড়ব, নইলে নয়। তুমি যদি নার্সিং পড়তে না দাও তা হলে ঘরে বসেই থাকব। তুমি বিয়ের ব্যবস্থা কর।

বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিলরে, কিন্তু যেদিন তোর স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী শুনবে তোর বাবার কথা, আমার এই দুঃখময় জীবনের কথা, সেদিন

তোর জীবন হয়ে উঠবে অশান্তিময়। তোর জীবন নষ্ট করবার আমার কোন অধিকার নেই। মানুষ আগে চলতে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে যদি শুধু অন্ধকার দেখে তা হলে সে মানুষ হোঁচট খায়। তোকে সেই হোঁচট খাওয়া জীবনে ঠেলে দিতে চাই না, পারবও না। তবে তুই যদি কখনো নিজে বিয়ে করিস, তখনো বোঝাপড়া করে নিয়েই করিস। সংসারটা অতি নিষ্ঠুর। যে লোকটি জানবে ও বুঝবে যে তুই তোতেই শেষ, সেই হতে পারবে তোর জীবনসঙ্গী। সেখানে পার্থিব লাভ না ঘটলে, হৃদয়ের দিক থেকে দারিদ্রের কশাঘাত থাকবে না, তুই দেবার পরিতৃপ্তিতে আনন্দ পাবি। যাদের নেবার তাগিদ থাকে তারাই চুলচেরা বিচার করে, তারা পান থেকে চুণ খসতে দিতে চায় না। তোর কাছে আসবে নেবার পাওনাদার, দেবার দেনাদার সেজে সারাটা জীবন শুধু দুঃখ কুড়িয়ে চলাই হবে তোর ভাগ্য। এসব বুঝে যদি চলতে পারিস তাহলে তোকে একা চলতে দিতে পারি। পারবি ?

পারব।

তাহলে নার্সিং পড়তে যা। আমার কোন আপত্তি নেই।

তিন

ট্রেনিং-এ যাবার আগের দিন দুপুরে মমতাময়ীর মেয়ে কোথায় যে গিয়েছিল তা কেউ জানত না। বেলা বারটা নাগাদ বাড়ির কাউকে কিছু না বলে কোনরকমে নাকেমুখে ভাত গুঁজে সে বেরিয়েছে, অথচ সন্ধ্যা উৎরে গেলেও সে ফেরেনি। যতই রাত বাড়তে লাগল ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল মমতাময়ী। রাত দশটা অবধি ঘরবার করতে করতে মমতাময়ী ও প্রাণদাচরণ ক্লান্ত হয়ে উঠল। দুশ্চিন্তায় ও ক্রোধে মমতাময়ী যেন ক্ষেপে উঠল।

শেষ অবধি থানা-পুলিশ করতে হবে নাকি ? মমতাময়ী মন্তব্যকরল।

প্রাণদাচরণ স্থিরভাবে বলল, অত চিন্তায় কাজ নেই। খুকি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, সে নিশ্চয়ই কোথাও কাজে আটকে গেছে। আসবে ঠিকই।

এমন সময় ক্লান্ত পদক্ষেপে পরিশ্রান্ত মমতাময়ীর মেয়ে এসে ঢুকল

ঘরে। কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে পায়ের জুতোজোড়া ছুঁড়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়।

মমতাময়ী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

বাবার কাছে গিয়েছিলাম, বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল মমতাময়ীর মেয়ে।

কেন গিয়েছিলি?

প্রাণদাচরণ বাধা দিয়ে বলল, তুমি থাম। দেখছ না মেয়েটা ক্লান্ত। গেছে, ভালই করেছে। তবে বলে কয়ে যেতে হোত মা। দেরি দেখে আমাদের কি ভাবনা তা তো বুঝছ!

ভুল হয়ে গেছে কাকাবাবু। এত দেরি হবে ভাবিনি।

কেন গেলি?

তার শেষ কথা শুনতে। এতদিন তুমি শুনেছ। এবার আমরা শুনতে চাই! তাই গিয়েছিলাম! বাবা চিরকালই বাবা থাকবে। হয়ত তাকে শ্রদ্ধা করব না, ভালবাসব না, কিন্তু বাবা তো বদল হবে না। তাই যদি হয়, তাহলে তার শেষ কথা শুনব না কেন!

আমাকে জিজ্ঞেস করে যেতে হত।

একবার ভেবেছিলাম, পরে ভাবলাম, ফিরে এসে তোমাকে বলব। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে কিনা? বাবা বলল, না। কেন? বাবা বলল, তোমার মা এর উত্তর দেবে।

বললাম, মা কেন উত্তর দেবে?

গৃহকে সুন্দর করবার দায়িত্ব তার সে তা পারেনি। উত্তর দিল বাবা।

বললাম, সন্তান কি অপরাধ করেছে।

তোমরা চলে এস আমার কাছে। যতদিন ঐ মায়ের কাছে থাকবে ততদিন আমার কোন দায়িত্ব নেই। একজন মহিলাকে ডেকে বলল, অনিমা, এই আমার মেয়ে। আমাকে বলল, এই তোমার মা।

চমকে উঠলাম। জানি না পুরুষের পরিতৃপ্তি কোথায় কিন্তু সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ তো সর্বকালের। আমার বাবার সে মমত্ববোধটুকুও যে নেই তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মহিলাটি বলল, তোমার মাকে বল, সে যেন ডাইভোর্স নেয়।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম, সে উপদেশ আপনার কাছে আমি নেব না। আমি এসেছি বাবার কাছে তার শেষ কথা শুনতে। যিনি দায়িত্ব পালন করেন না তিনি শাসন করবার অধিকারী নন, আমিও শিশু নই। ভবিষ্যতে এ রকম কথা আপনার কাছে শুনতে আমি রাজি নই।

বাবা উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে বসেছিল।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, বল তোমার শেষ কথা।

মুখ নিচু করেই বলল, বলেছি তো। আমার কাছে যদি থাক তাহলে আমি সব দায়িত্ব পালন করব। তোমার মায়ের কাছে থাকলে আমার কাছ থেকে কোন কিছুই পাবে না।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে উঠে এলাম। ছ' মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে এসেছি। কোথাও দাঁড়াইনি। এক গ্লাস জল অবধি খাইনি। মনে মনে ঠিক করেছি, এব উত্তর আমি দেব। যদি ভগবান থাকেন, এর সমাপ্তি একদিন আসবেই। সেদিন পিতার কাছে সন্তানের মূল্যবোধ ভাল করে দেখা দেবে। তুমি ভয় পেও না মা। আর তিনটে বছর মাত্র।

মেয়ের কথা শুনতে শুনতে মমতাময়ীর স্নায়ুগুলো ক্রমেই অবশ হয়ে আসতে লাগল। অনিমা দত্তের ইতিহাস পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। যে আশঙ্কা তার ছিল তা যে মিথ্যা নয় তা বুঝে হতাশার সুরে বলল, এত কথা বলতে পারলি তুই!

বলতে বাধ্য হয়েছিলাম!

মমতাময়ী অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়েছিল। তার তেজো-দৃপ্ত মুখখানা দেখে গর্বিত বোধ করছিল। বলে উঠল, তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস!

যা হয়নি তা নিয়ে আপশোষ করে কি লাভ। আমি মেয়ে হয়েই তোমার ছেলের কাজ করব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নতুও বড় হবে একদিন সেও এগিয়ে আসবে তোমাকে সাহায্য করতে। আমরা দুজনে তোমার দুঃখ আর কলঙ্ক মোচন করবই করব।

মা ও মেয়ে পাশাপাশি শুয়ে। দুজনের চোখেই ঘুম নেই। মমতাময়ী মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। মেয়ে গোপনে চোখের জল মুছছে। দেওয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজতেই মেয়ে ধরমর করে

বিছানা ছেড়ে উঠল। মমতাময়ী জিজ্ঞেস করল, এত সকালে উঠছিস কেন?

সাড়ে পাঁচটার গাড়িতে বের হতে হবে। সবকিছু গুছিয়ে নিতে সময় দরকার যে।

তুই শুয়ে থাক, আমিই গুছিয়ে দেব।

আমি-ই করছি, তুমি বরং শুয়ে থাক। কাকাবাবুকে ডেকে তুলতে হবে। না ডাকলে সাতটার আগে তার ঘুম ভাঙ্গবে না।

মমতাময়ীর মেয়ে ডেকে-হেঁকে প্রস্তুত হয়ে নিল।

বিছানা বাক্স বেঁধে প্রাণদাচরণ রিক্সায় উঠে বসল মমতাময়ীর মেয়েকে নিয়ে। বেলা নটা না বাজতেই হাজির হল নারীসেবাশ্রম হাসপাতালে।

প্রাণদাচরণ মমতাময়ীর মেয়েকে রেখেই চলে আসছিল। ফিরে তাকিয়ে দেখে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে কাঁদছে। এগিয়ে এসে বলল, কাঁদিসনে মা। দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে যাবে। ভাল করে কাজকর্ম শিখে নিজের পায়ে দাঁড়া, তা হলেই তোর মায়ের দুঃখ ঘুচবে।

প্রাণদাচরণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মেয়ে বলল, আশীর্বাদ কর কাকাবাবু। আমি জানি সব, বুঝি সব। তবুও সয়ে চলেছি সুসময় পাবার আশায়। চোখ মুছে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সে।

নতুন পরিবেশকে আপন করে নিতে বেশি সময় দরকার হয়নি। নার্স হোস্টেলের মেয়েদের সাথে পরিচয় করে নিল দু-তিনদিনের মধ্যেই। পাশের ঘরের ঝর্ণা বয়সে সবার ছোট। তার সাথেই সৌখ্য জন্মাল বেশি। ঝর্ণা এসেছে পুরুলিয়া থেকে। রাঢ়ের কথাগুলো বেশি সুন্দর লাগত তার। সময় পেলেই বসে বসে তার সাথে গল্প করত। ঝর্ণা বলত তার দেশের গল্প। বলত, তোরা যে ভাবে জল নষ্ট করিস, দেখলে আমার মনটা রি-রি করে। হায়রে, এত জল যদি আমরা পেতাম। আমাদের টাউনে জল আনতে যেতে হয় সাহেববাঁধে। সেই বাঁধের জল গোটা শহরের ভরসা। এক টিন জল এক আনা। বুঝলি তো!

মমতাময়ীর মেয়ে হেসে বলত, এখানে ভাল করে গলাটা ভিজিয়ে নে। যখন ঘরে ফিরবি তখন ভেজা গলায় আর কষ্ট হবে না।

স্নেহলতা বালুরঘাটের মেয়ে। এবার তার কোর্স শেষ। বয়সে ও

মর্যাদায় উপর শ্রেণীর মেয়ে। মাঝে মাঝেই উপদেশ দেয় নতুন মেয়েদের। দুঃখ তারও কম নয়। সে বলত তার পরিবারের কথা। মমতাময়ীর মেয়ে আগ্রহ সহকারে শুনত তার গল্প।

একদিন গল্প বলতে বলতে কেঁদেই ফেলল স্নেহলতা। বলল, আমরা যে কি কষ্টে বাস করছি তা বুঝিয়ে বলা যায় না। সারাদিন আমরা তিনটে ভাইবোন খেতে পাইনি। রাস্তার ধার থেকে শাক তুলে নুন দিয়েই সেদ্দ করছিল মা। আমাদের য়্যানামেলের বাটিতে তাই খেতে দিয়ে মা কাঁদছিল। বাবা গেছেন শহরের বাইরে মজুরি পাবার আশায়। দেশে যখন ছিলাম, সেখানে ছিল কয়েক বিঘে জমি আর বাবা করতেন পাঠশালার মাস্টারি। এদেশে এলেন ভিক্ষাপাত্র হাতে করে। ভিখারি সেজে বেড়াতে পারেন নি। শ্রমের মর্যাদা জ্ঞান ছিল টনটনে। কোথাও কোন কাজ যখন পেলেন না তখন ঠিকাদারের মজুরি সেজে মাটি কেটে ঝুড়ি বোঝাই দিয়ে রাস্তার কাজে লাগলেন। শহরের কেউ কেউ চিনত, তাই শহরের বাইরে যেতেন মাটি কাটতে। রাতের বেলায় ফিরতেন একটাকা পাঁচসিকে হাতে করে। তা দিয়েই পেট চালানো, পোশাক পরিচ্ছদ, ঘরভাড়া আমাদের পড়াশোনা। আমি তখন বড় হয়েছি। বাড়িতে একখানা মাত্র শাড়ি। আমি পড়ে যেতাম স্কুলে, বিকেলে এসে খুলে দিতাম, তাই পড়তেন মা। সে যে কি কষ্ট।

কান্না থামিয়ে স্নেহলতা আবার বলল, রাতের বেলায় বাবা আমাকে পড়াতেন, বলতেন, আমার একটা মেয়ে যদি দাঁড়ায় তা হলে সবাই বাঁচবে। একে যেমন করে পারি দাঁড় করাবো। এমন দিন গেছে বাবা এসে সামনে বসতে পারতেন না, লজ্জায় ছুটে গিয়ে আমি আমার মায়ের পাশে বসতাম। বাবার দুঃখ বুঝতাম। চুপি চুপি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, পাশ করতে পারলাম না!

মনের দুঃখে তিনদিন বিছানা থেকে উঠলাম না। দুঃখ হল। বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবার পরীক্ষা দে। আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম আর পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা ছিল না। কাজ খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম এই ট্রেনিং-এর সুযোগ। চলে এলাম কলকাতায়। সারা বছর কষ্ট করে টাকা জমাই কিছু কিছু। তা থেকে মায়ের শাড়ি, ভাইবোনদের কাপড় কিনে পাঠাই। কখনো নগদ দু-পাঁচ টাকাও পাঠাই। কিন্তু সমস্যা

এখনও সমাধান করতে পারিনি। এবার বোধহয় সুযোগ পাব। বাবার দেহ জীর্ন, মাও পেটভরে খেতে না পেয়ে মরণের ক্ষণ গুনছে। এবার যদি পাশ করি তা হলেই বাঁচব, অবশ্য যদি চাকরি পাই।

ঝর্ণা বলল, সরকার চাকরি দেবে বলেই তো ট্রেনিং দিচ্ছে। বণ্ড লিখিয়ে নিয়েছে।

অত দুঃখেও স্নেহলতা হেসে চুপ করে গেল। তখনও তার গালে অশ্রুর দাগ।

মমতাময়ীর মেয়ে ওদের গল্প শুনে কেঁদে ফেলত। ঝর্ণা অবাক হয়ে বলত, তুই কাঁদছিস কেন?

ওর বাবার কথা শুনে। এই তো বাবা, মাটি কেটেও সন্তানদের বড় করছে। আর—, বলতে পারল না যে তার বাবা একটি সন্তানকেও দাঁড় করায়েও দেয়নি। একজন যদি দাঁড়াত, আর সে কাজটা যদি তার বাবা করে দিত তাহলে আজ তাদের কলঙ্ক টিকা কপালে বহন করতে হত না।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল মমতাময়ীর মেয়ে।

স্নেহলতা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তোর বেদনা কোথায় জানি না, তবে তুই আমার সঙ্গী তা বুঝছি।

সবাই বুঝল, কোথাও কোন আঘাত রয়েছে, সে আঘাতের ক্ষত কাউকে দেখাতে না পারলেও যন্ত্রণাটা মুখের রেখা পরিবর্তন করছে। বেদনার আর্তনাদ ফেটে পড়ছে কান্নায়। মমতাময়ীর মেয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে চুপ করে বসে রইল।

সেদিন আউটডোরে বসেছিল মমতাময়ীর মেয়ে। ফোন য়্যাটেণ্ড করা আর অনুসন্ধিৎসুদের উত্তর দেওয়াই তার কাজ। কতলোক আসছে, সংবাদ জানতে চাইছে। সংক্ষিপ্ত সংবাদ শুনে কতজন ফিরে যাচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে না একজন ভদ্রলোক। বারবার এসে জানতে চাইছে, নয়নতারার অবস্থা কেমন।

খবর আনিয়ে দিচ্ছি, দু-তিনবার জবাব দিয়েছে মমতাময়ীর মেয়ে।

ভদ্রলোক বসবার আসনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই জানতে আসছে, এল সংবাদ!

না। আরেকটু বসুন।

আবার ফিরে যাচ্ছে ভদ্রলোক।

স্লিপ নিয়ে এল বেয়ারা।

মমতাময়ীর মেয়ে হাঁকলো, নয়নতারা বসু।

ভদ্রলোক ছুটে এল।

Male child, all O. K.—স্লিপটা এগিয়ে দিয়ে চেয়ে রইল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। কি অপূর্ব প্রশান্তি নেমে এসেছে তার মুখে। আনন্দের রেশ যেন মূক অভিনয় করে জানিয়ে দিচ্ছিল মনের কোণায় সঞ্চিত উচ্ছ্বাস। মমতাময়ীর মেয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিল। ঐ চাহনীর সম্মুখে ভদ্রলোক কেমন সঙ্কুচিত হয়ে 'ধন্যবাদ' বলে ছুটে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মমতাময়ীর মেয়ে হাতের পেনসিলটা অযথা নাড়াচাড়া করতে লাগল। নিজের মনেই বলল, ইনিও একটি বাবা!

কিছুক্ষণের মধ্যেই একবাক্স সন্দেশ নিয়ে ফিরে এল সেই ভদ্রলোক। মমতাময়ীর মেয়ের সামনে রেখে বলল, আপনি প্রথম সংবাদ দিয়েছেন, আপনার মুখ মিষ্টি করাতে এনেছি।

অসারে মমতাময়ীর মেয়ে বলল, বাবা!

কিছু বলছেন?

না। এ নেওয়া নিষেধ।

কেন। আমি তো ঘুষ দিচ্ছি না। আমি আমার সন্তানের মঙ্গল কামনা করে কারও যদি মুখ মিষ্টি করিয়ে দি তাতে অন্যের কিছু বলবার আছে কি!

তবুও।

না, না। এ নিতেই হবে, বলেই বাক্সটা রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল ভদ্রলোক। কোন কথা বলবার অবকাশ রইল না। বেয়ারাকে ডেকে বাক্সটা তুলে দিল তার হাতে।

দিদিমণি! বিস্মিত বেয়ারার কণ্ঠস্বর।

বাধা দিয়ে বলল, মুখ মিষ্টি কর তোমরা।

হোস্টেলে ফিরে এসে মমতাময়ীর মেয়ে কেবল ভেবেছে ঐ নতুন 'বাবা'র কথা। পিতৃত্বলাভ যে কত মধুর ও আনন্দের তা আজ সে বুঝেছে। তখনও ভদ্রলোক সন্তানের মুখ দেখেনি অথচ সন্তান জন্মের সংবাদেই পিতৃত্ববোধের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আর তার বাবা! সেও হয়ত তার জন্মদিনে এমনই আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল, সেও হয়ত সংবাদ

পরিবেশন করতেই ঐ ভদ্রলোকের মত ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর ! কে জানে ! যে পিতৃত্ব তাকে মহান করতে পারত, সেই পিতৃত্বকে স্বার্থের সংঘাতে অভিশপ্ত করে তুলেছে। অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে তার সন্তান।

কেন এমন হল ?—এই 'কেন' নিরুত্তর।

তার রুমমেট গীতা বিবাহিতা। গীতা স্বেচ্ছায় স্বামী পরিত্যাগ করে নার্সিং পড়তে এসেছে। কেন ?—জিজ্ঞাসা করেছিল মমতাময়ীর মেয়ে।

গীতা বলেছিল, স্বামীর আদর আমি পাইনি, পেয়েছিলাম শাশুড়ী-ননদের তাড়ণা। অনেকদিন সহ্য করেছি। মনে করেছিলাম ধীরে ধীরে সয়ে যাবে। কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। পালিয়ে গেলাম বাবার কাছে। বাবা বললেন, এটা তোমার ঘর নয়, তোমার নিজের ঘরে ফিরে যাও। বাবা বুঝিয়ে বললেন, আরেকবার চেষ্টা করে দেখ। যদি তাতেও না হয় তাহলে আমি ব্যবস্থা করব। গেলাম, কিন্তু স্থান হল না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি অপরাধ আমার ?—সে বলল. মা জানে। বললাম, আমি তোমার স্ত্রী। আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। তার উত্তরেও সে বলল,—মা জানে। মাতৃভক্তির দৃষ্টান্তে নেপোলিয়নকে হার মানাল। যুক্তি তর্ক বৃথা। স্বামীর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে। ফিরে এলাম বাবার কাছে। লেখাপড়া শিখলাম, এলাম নার্সিং পড়তে। নিজের জীবনের সাথে নিজেকে বোঝা করে নিয়ে চলেছি, আর একটা বছর কাটাতে পারলেই বাঁচি।

মমতাময়ীর মেয়ে পতিগৃহের জ্বালা জানে না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে কত তিক্ত হয় তা সে দেখেছে তার বাবা-মায়ের কার্যকলাপে। একদিন গীতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যদি তোমার স্বামী তোমাকে ফিরিয়ে নিতে আসে তাহলে তুমি যাবে না।

গীতা মোটেই গুরুতরভাবে একথা চিন্তা করেনি, লঘুভাবে বলল, না।

কেন ?

কেন তা বলতে পারব না। তবে মায়ের ঐ নিরেট বাছাধন এবার বুঝছে মজাটা। না পারছে বিচ্ছেদ ঘটাতে, না পারছে বিয়ে করতে। কেমন জব্দ ! নতুন আইনটা বাঁচিয়েছে ! তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে গীতা উৎসাহের সঙ্গে বলল, তুই হলে কি করতিস ?

আমি। সে সুযোগ এখনও আসেনি, এলে ভেবে বলব।

গীতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মমতাময়ীর মেয়ের ভালই লাগে, তবুও মনে হয়, এ সমস্যা ওরা দুজনে বসে সমাধান করতে পারত সে চেষ্টা করা গীতার উচিত ছিল।

এর চেয়ে ভাল লাগত নির্মলা বর্ধনকে।

নাইট ডিউটির শেষের দিকে ক্লান্তিতে দেহটা ভেঙ্গে এসেছে। নির্মলা গা এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারে। মমতাময়ীর মেয়ে তখনও রাউণ্ড দিচ্ছে, রুগীর অবস্থা দেখছে। নির্মলা ডাকল, শোন।

কেন? এগিয়ে এল মমতাময়ীর মেয়ে।

এখানে পুরুষ ডাক্তার নেই তাই তোরা বেঁচেছিস! আমি প্রথম যেখানে ট্রেনিং-এ ছিলাম তখন পুরুষ ডাক্তারের অত্যাচারে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়তে হত। ডাক্তার-ই নয়, কম্পাউণ্ডার বেয়ারা সবাই যেন প্রসাদ পেতে নেড়ি কুকুরেব মত ল্যা-ল্যা করত।

সব ডাক্তার কি সমান?

তা ঠিক। তবে আমাদের হয়েছিল বিপদ, ছ'জনের চারজনই ছিল শিকারী।

ঝুলে পড়লেই পারতি।

তা কি চেষ্টা করিনি। আসলে ওরা ঝুলতে দেয় না, ঝোলাতে চায়। তাই তো পালিয়ে বেঁচেছি। বাবাঃ! সে কথা আর বলিস না।

একটা রুগী যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। মমতাময়ীর মেয়ে ছুটে গেল তার কাছে।

জল। রুগীর প্রার্থনা।

জল দিল তার মুখে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে আবার রাউণ্ড দিতে লাগল।

নির্মলা আবার ডাকল, শোন।

আবার এসে দাঁড়াল মমতাময়ীর মেয়ে।

কাউকে ভালবেসেছিস কখনো?

না। অবসর পাইনি।

ভালবাসিস নি! তা হলে তোর জন্মটা বৃথা, বয়সটা বৃথা। ভালবাসলেই যে ঘর বাঁধতে হবে এমন কথা কোন মহাভারতে নেই। ভালবাসতে শেখ। একেবারে নিখাদ ভালবাসা। শুনিসনি একটা গল্প। একটা নার্স

ভালবাসল একটা রুগীকে। রুগী আরাম হয়ে নার্সকে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করব। নার্স হেসেই বাঁচে না। বলল, কেন?—তুমি আমাকে ভালবাস। গম্ভীরভাবে নার্স বলল, মোটেই নয়। তোমার নিরাময় যাতে হয়, তার জন্য ভালবাসার অভিনয় করতাম। তুমি সুস্থ সবল হয়েছ, আমার অভিনয়ের দাম পেয়েছি। এবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।—এই ভালবাসায় যে কি মাধুর্য তা তুই জানিস না। ধরা দিবি না, ছোঁয়া দিবি না, শুধু নিজে ভাববি, অপরকে ভাবতে দিবি। তাতেই আনন্দ, দুশ্চিন্তা, আর কর্ম নষ্ট! সারা জীবনের ঘর বাঁধার চেয়ে এতেই সুখ বেশি।

মমতাময়ীর মেয়ে হাসল।

হাসছিস। আমিও আগে হাসতাম। তারপর সত্যিই একদিন ভালবাসলাম। আর সে লোকটা কে জানিস?—একটা রুগী। তাকে ভালবেসেছিলাম বলেই সে নিরোগ হয়েছিল। কত ভাবতাম তার কথা। তাকে যা সেবা করেছিলাম তা তুই না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। তারপর নিরোগ হয়ে সে ফিরে গেল। যাবার সময় কত সোহাগের কথা শোনাল। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। মাঝে মাঝে আসত, দেখা করত, গল্প করতাম, সিনেমায় যেতাম। তারপর একদিন সে এল হোস্টেলে সঙ্গে এক মহিলা। বলল, আমি বিয়ে করেছি, এই আমার পরিবার। তোমার সঙ্গে পরিচয় করাতে সঙ্গে করে এনেছি। আমি চমকাইনি। পাশে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো আমাকে ভালবাসতে?—সে বলল, এখনও তোমাকে ভালবাসি। বললাম, এই বুঝি ভালবাসার নমুনা। হেসে বলল, তুমি ভুল করেছ নির্মলা। তোমাকে ভালবাসা যায়, তোমাকে বিয়ে করা কি যায়! নার্সকে বিয়ে করলে মুখ দেখাতে পারতাম কি!—আমিও হেসে ফেললাম, বললাম, তোমার মুখটা যাতে আমাকেও আর দেখতে না হয় তার ব্যবস্থা কর, তা হলেই খুশি হব।—আমার ভালবাসার পর্ব শেষ। লেন-দেনটা ভেজালহীন হওয়াই ভাল। নার্স আর কলকাতার বাড়িওলার ছেলের বিয়ের চেয়ে ওদের নিজেদের পরিবার থাকাই ভাল! বাড়িওলার পরিবার হল শূন্য কলসী, আদর করলে ঠনঠন করে বেজে ওঠে, ঝঙ্কার দেয় না। আর নার্স হল বোরেগীর করতাল, ঝঙ্কারে কান ফাটে।

মানে ?

মানে বুঝলে না। ঘর বাঁধার আশা আর রইল না। তবে ট্রেনিংটা কমপ্লিট হল। তাকে ভালবেসে তার জন্য চিন্তা করতে শিখেছিলাম, আন্তরিকভাবে সেবা করতে শিখেছিলাম। রুগীকে সহানুভূতি জানাতে শিখেছিলাম। ভবিষ্যতে যদি আবার কাউকে ভালবাসি তা হলে কি ভাবে ভালবাসা জানাতে হবে তা আর শিখতে হবে না। আক্কেল সেলামি ভালই দিয়েছি। প্রথম পর্ব শেষ, এবার দ্বিতীয় পর্বের নাগর খুঁজছি। গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হবে না, সোজাসুজি ভালবেসে ফেলব। যারা প্যানপেনে পরিবার চায়, নার্স বউ চায় না, তাদের মুখে হাসি ফোটাব, বুঝলি তো!

হেসে উঠল দুজনেই।

কেবল ঠাট্টা। দাঁত চেপে মন্তব্য করল মমতাময়ীর মেয়ে।

নারে না, সবটাই সত্যি। কত রাত জেগে কাটিয়েছি। হুঁ। বিশ্বাস কর। আমি অনর্থক মিছে কথা তোকে কেন বলব।—হাসল নির্মলা বর্ধন। হাসতে হাসতে চেয়ারে ভাল করে হেলান দিয়ে বসল। মমতাময়ীর মেয়ে আবার রাউন্ড দিতে লাগল।

নির্মলার ঠাট্টার পেছনে কত দুঃখ, অভিমান ও ঘৃণা যে লুকিয়েছিল তা বুঝতে পেরে সে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। বিচিত্র জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল মমতাময়ীর মেয়ে। ভাবল, এই তো জীবন, এসব জীবনকে জানতে না পারলে বৃথাই কাটত তার জীবনের শুভক্ষণগুলো, জানবার অবসরও সে পেত না বিচিত্র জীবনের গতিকে যদি এদের সঙ্গলাভ না ঘটত।

সকাল সাতটায় ফিরে এসেই স্নান করল। এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খাবার ঘন্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, ঘুম ভাঙ্গেনি। কেউ ডেকেও দেয়নি। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন ক্লাশের ঘন্টা পড়েছে। ঝর্ণা ক্লাশে যাবার আগে তার খোঁজে এসেছিল! ঘুমোচ্ছে দেখে ঠেলে তুলল, ক্লাশে যাবি নে ?

যাব। কটা বাজে ? চোখ মুছতে মুছতে বলল মমতাময়ীর মেয়ে।

দুটো বেজে গেছে।

দুটো! খুব ঘুমিয়েছিলাম। খাবার ঘন্টাও শুনিনি, তোরাও ডাকিসনি। কিছু খেতে দিবি ঝর্ণা।

নাইট ডিউটির পর সবারই এরকম হয়। ঝর্ণাও ভুক্তভোগী। হেসে বলল, যা হাত মুখ ধুয়ে আমার ঘরে আয়। দুধরুটি আছে।

ঝর্ণার রুমে দুধরুটি খেয়ে ছুটল ক্লাস করতে। আজ ছিল থিওরির ক্লাশ। ডাক্তার মিসেস্ ব্যানার্জি গাইনাকোলজির মোটামুটি ফর্মুলা-গুলো পড়ালেন। যে যার মত নোট টুকে ফিরে এল হোস্টেলে। এখনই আবার ডিউটিতে বের হতে হবে।

মমতাময়ীর চিঠি এসেছে। মমতাময়ী লিখেছে : দুটো বছর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল। তোর খুব কষ্ট হচ্ছে কি। কোনরকমে আরেকটা বছর কাটিয়ে দিবি। নতু তোর কথা রোজই বলে। তোর কাকাবাবু বলে, খুকি একদিন বড় হবে। আমি ও ভাবি তুই বড় হলে, কত বড় হবি। সেদিন তোদের দুঃখ ঘুচলে আমি পাব অপরিসীম আনন্দ। শুভেচ্ছা নিস্।

চিঠিখানা দুতিনবার উল্টেপাল্টে পড়ে বালিশের তলায় রেখে কেবল উঠতে যাচ্ছিল এমন সময় এল স্নেহলতা। এই হাসপাতালেই সে চাকরি পেয়েছে। বলল, কার চিঠি রে ?

মায়ের।

দেখি, আগ্রহ সহকারে হাত বাড়াল স্নেহলতা।

মায়ের চিঠি তুমি কি দেখবে স্নেহদি ?

রাগ করলি ভাই। সস্নেহে প্রশ্ন করল স্নেহলতা।

না না। রাগ করব কেন।

স্নেহলতা হেসে বলল, মা বাবার চিঠিই দেখতে হয় ভাই। অন্য কারও চিঠি দেখে জ্বালা বাড়িয়ে তো লাভ নেই। অনেক সময় ঘেন্নাও ধরে। দোতলার সাত নম্বরের অসীতা নাগকে তো চিনিস। আমাদের সাথে পড়ে। তার কাছে একবার গিয়ে ছিলাম postnatal-এর note খাতা-খানা আনতে। গিয়ে দেখি অসীতা ঘরে নেই। দরকার ছিল বেশি। তার সেল্‌ফ্ থেকে খাতাখানা টেনে বের করতেই তা থেকে বের হল এগারখানা চিঠি। এগারখানাই প্রেমপত্র। আর লেখক একজন নয়,

ছয়জন আলাদা ব্যক্তি। কারও একখানা, কারও তিনখানা। নামগুলো মনে নেই, নইলে বলতাম।

মমতাময়ীর মেয়ে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করল না। চুপ করে বসে রইল। স্নেহলতা দম ধরে আবার বলল, জিজ্ঞেস করেছিলাম অসীতাকে, তোর প্রণয়ভাজন কজন ?

অসীতা হেসে বলেছিল, অনেকজন।

আমিও গম্ভীর ভাবে বললাম, ম্যানেজ করতে পারিস তো।

অসীতা ঠাট্টার সুরে বলল আমি তো সীতা নই, অ-সীতা। আমার সাথে ছজন ছাড়া ছশোজনের প্রণয় কি একেবারেই অসম্ভব। এই যে সব অভাজন, এদের কারও সাথে আমার দেখা হয়নি আজও। দূর থেকেই প্রণয় নিবেদন চলছে। আমিও কাগজ কলমে ম্যানেজ করছি। আমার বিধবা অসহায় মায়ের অন্নবস্ত্রের সমস্যা ওরাই মেটায়। আমি দূরে বসে উপভোগ করি। এরপর আর কিছু দরকার হয় কি !

তা হলে কাউকেই তুই ভালবাসিস নে।

অসীতা খিল-খিল করে হেসে বলল, ওরা ভালবাসা চায়না রে, ওরা চায় আমাকে। হাসপাতালের নার্স যদি প্লেন ড্রেসে সেজেগুজে ওদের সহচরী হয় তা হলেই খুশি। আমার ভালবাসা পাবার লোক এখনও খুঁজে পাইনি। মানুষকে পাওয়া আর মানুষের ভালবাসা পাওয়া এক কথা নয়। তাই ওরা কোনটাই পায়নি। আমি আড়ালে বসে আশার প্রদীপ জেবলে রেখেছি। ওরা পোকার মত উড়ে এসে সেই প্রদীপের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বুঝলি।

বলেই স্নেহলতা থামল।

মমতাময়ীর মেয়ে চুপ করে শুনছিল। স্নেহলতার কথা শেষ হতেই বাইরে পা বাড়াল। স্নেহলতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস ?

খেতে। আজ আবার নাইট, দুপুরে ভাত জোটেনি, এবেলায় আবার কি হয় দেখি।

চার

একটানা দুবছর হোস্টেলে থাকার পর দু সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ফিরে এল মমতাময়ীর মেয়ে তার মায়ের কাছে। কোনরকম সংবাদ না দিয়েই

এসেছে। রিক্সা থেকে নেমে সোজা রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে মাকে জাপটে ধরল। মমতাময়ী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেও মেয়েকে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে মেয়েকে বুকের সাথে চেপে ধরল। এ আনন্দের উপলব্ধি অন্যের হিসাবের বাইরে। মেয়ে বসল মায়ের কাছে, বলতে লাগল তার দু বছরের জীবনে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কথা আর শেষ হতে চায় না। রাতের বেলায় মায়ের পাশে শুয়ে অবিশ্রান্ত বকেই চলেছে। মোটেই বিরক্তি নেই, মোটেই ক্লান্তি নেই দুজনার। প্রাণদাচরণ উন্মুখ হয়ে শুনছিল তাদের কথা। পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্নও করছিল। মমতাময়ীর মেয়ের সঙ্গী স্বাতী, সহ পাঠীদের কথা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহার, শেখাবার পদ্ধতি। রুগীদের অবস্থা সবকিছু বলতে বলতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সকালবেলায় চা জলখাবার নিয়ে মমতাময়ী এসে ডেকে তুলল তাকে।

প্রতিবেশী নিশীথ বারিকের ছেলে অজিত বিমান বাহিনীতে কাজ করে। ছ' বছর দেশের বাইরে ছিল। ছুটি পেয়ে সেও এসেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। বিকেলবেলায় সেজে গুজে সে বের হয়েছে পাড়া টহল দিতে। তার পথ চট্টরাজদের বাড়ি পর্যন্ত। সেখান থেকে অনেক রাতে ফিরে আসে। বহুদিন পর দু' মাসের ছুটি পেয়েছে। পূর্ণ উপভোগ করছে ছুটির দিনগুলো। তার বাড়িটা হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। মমতাময়ীর মেয়েও শুনেছে তার কথা। মা তাকে যেতে বলেছিল ওদের বাড়িতে। মেয়ে যেতে রাজি হয়নি।

বিকেলবেলায় সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল মমতাময়ীর মেয়ে। অজিত ঐ পথেই যাচ্ছিল। তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ছোটবেলায় তাকে দেখেছে, ছ' বছর পর আবার তাকে দেখল। তখন দেখেছে ফ্রক পরা মেয়ে আজ দেখল শাড়িপরা পূর্ণায়ত মেয়ে। চিনতে বিশেষ কষ্ট হল না, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, খুকি না ?

হাঁ, ছোট্ট জবাব দিল মমতাময়ীর মেয়ে।

কি করছ আজকাল ?

মেয়েরা যা করে। ঘরকন্না গেরস্তালী, নিদেন পক্ষে লাঞ্ছনা সহ্য।

কি বলছ ! আশ্চর্য হয়ে গেল অজিত।

না, এমন কিছু নয়। তুমি কি বিমান বাহিনীতেই আছ ?

হাঁ। তুমি কি করছ বললে না তো!

নার্সিং পড়ছি।

তাই বল। তুমি নিয়েছ সেবার ধর্ম আর আমি নিয়েছি দেশ-রক্ষার ধর্ম।

তাকে জড়িয়ে কথাটা বলাতে খুকি মনে মনে অসন্তুষ্ট হল। যখন কথা শেষ করে হো-হো করে অজিত হেসে উঠল তখন মনে হল অসহ্য পরিবেশ যেন সৃষ্টি করছে। মমতাময়ীর মেয়ে দরজা বন্ধ করে দিল তার মুখের সামনে। অজিত ইঙ্গিতটা বুঝল। হাসাটা যে উচিত হয়নি তাও বুঝল।

কদিন পর আবার দেখা দুজনের। কেউ কাউকে কোন কথা না বলে উল্টোপথ ধরল। অজিত নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে করতে লাগল। আর চাপা ক্রোধে গুমরাতে লাগল। মনে মনে বলল. So many girls I came across আর একটা পুঁচকে মেয়ে তাও যার বৃত্তি নার্সের কাজ। তার এত দেমাক। শায়েস্তা করতেই হবে।

অজিত কদিন ধরে চিন্তা করে পথ পেল না। কি করে মমতাময়ীর মেয়ের সাথে আলাপ জমানো যায় তার চিন্তাই সে করেছে। কোন পথ না পেয়ে নতুকে ডেকে বসাল তার পাশে। আরম্ভ করল নানা গল্প। যত আজে-বাজে কথা। বিমান কি করে চলে, কি করে ভাল বৈমানিক হওয়া যায়, ব্যাঙ্গালোর কেমন জায়গা, আরও অনেক কিছু।

নতু আগ্রহ সহকারে শুনছিল, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিল। এদিকে ফুটবল খেলার সময় হতেই সেও উঠবার চেষ্টায় ছিল। অজিত বলল, কেমন বুঝলে আমাদের জীবন।

ভালই। আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পার অজিতদা?

পারি। তোর মায়ের মত নে, যদি তোর মা মত করে তবেই।

নতু কিছুক্ষণ ভেবে বলল, মায়ের মত নেবই নেব।

বেশ। চেষ্টা কর। তবে বাপ-মায়ের একছেলে তুই।

চেষ্টা করতে হবে না। মত পাবই। মানুষ তো চিরকাল বাঁচে না। Defence-এ গেলেই মরতে হবে এমন কোন কথা কি আছে! কালতো গাড়ি চাপা পড়েও মরতে পারি। তুমি যদি ভরসা দাও তাহলে মায়ের মত করবই করব।

তোর মায়ের মত পেলে আমি চেষ্টা করব।

নতু উৎসাহিত হয়ে ফিরে গেল। ফুটবল খেলা শেষ করে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বসল। মমতাময়ী জানে কোন উদ্দেশ্য না থাকলে নতু এ সময় তার কাছে এসে বসে না।

তোর কি মতলব বল দেখি?

অজিতদা এয়ার ফোর্সে কাজ করে। সে বলছিল, তুমি যদি মত দাও তা হলে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দিতে পারে।

মমতাময়ীর মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। মায়ের বদলে সেই জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তোর বিমানবাহিনীতে যাবার সখ হল কেন? আর কোন কাজ কি নেই সারা ভারতে।

বারে। অজিতদা তো সেখানেই কাজ করে। সেখানে সহজেই ঢোকা যাবে।

অজিতদা বি-এস-সি পাশ করে গেছে। তার ফিউচার আছে। তোর কি আছে? সে হয়েছে ইনজিনিয়ার আর তোকে হতে হবে কুলী-মজুর। বেশ তোর aim দেখছি।

নতু বাধা দিয়ে বলল, যে কাজ আমাকে suit করবে তাই করব। তোমরা মত দাও।

মমতাময়ী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তোর কাকাবাবু অফিস থেকে ফিরে আসুক, তাকে জিজ্ঞেস করে তার মতটা নিয়ে তবে বলব।

অজিতের বুদ্ধির দৌড় বুঝতে মমতাময়ীর মেয়ের মোটেই বিলম্ব ঘটল না। অজিতের উস্কানিতে নতু বিমানবাহিনীতে যাবার ধুয়া তুলেছে নিশ্চয়ই। মনে মনে সে এর শোধ তুলবার প্রতীক্ষা করছিল। পরদিন বিকেলবেলায় দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল সে, অজিত তাদের বাড়ির সামনে আসতেই ডাকল, অজিতদা শোন।

অজিত এই আহ্বানের প্রতীক্ষাই করছিল। ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল।

আমাকে ডাকছ খুকি?

হাঁ। নতুকে এয়ারফোর্সে ঢোকবার পরামর্শ তুমি-ই বুঝি দিয়েছ?

কথাটা ঠিক হল না। নতু বলছিল সে এয়ারফোর্সে কাজ চায়। আমি বললাম, তোমার মায়ের মত পেলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

মমতাময়ীর মেয়ে শক্ত কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। অজিতের সুপুষ্ঠ দেহের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। এত ভাল করে অজিতকে এর আগে কখনো বোধহয় দেখেনি। অজিতের ঠোঁটে যেমন একটা হাসি, দুষ্টুমিভরা কিনা কে জানে।

মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার একটাই ভাই।

জানি। মানুষের একটার বেশি দুটো জন্ম হয় না। একবারের বেশি দুবারও কেউ মরে না।

মমতাময়ীর মেয়ে নীতি কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবুও না থেমে বলল, এত জেনেও মানুষ প্রিয়জনকে দূরে ঠেলে দিতে চায় না।

চায় না বলেই তো দূরে যায়। মেয়ের বিয়ে দিলে পরের ঘরে যায়। ছেলে যায় কর্মকেন্দ্রে। বাবা-মা অতি প্রিয়জন, তারাও পেছনে পড়ে থাকে।

নতুকে ও-কাজে আমরা যেতে দেব না। তুমি ওকে বুঝিয়ে দিও।

যেতে দেওয়া না দেওয়া তোমাদের ইচ্ছা। আমাকে বললে বলব, তোমরা যেতে দিতে চাও না।

অজিত এগিয়ে যেতেই ডাকল, শোন। তুমি ইচ্ছে করে নতুকে ঘর ছাড়ার মতলব দিয়েছ।

মোটেই নয়। সেই আমার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে, নইলে আমার ভারি গরজ।

গরজ! বেশ! বলে মমতাময়ীর মেয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরে বসে অপমানের জ্বালায় দগ্ধে মরতে লাগল। বার বার ঐ সুপুষ্ঠদেহী লোকটির কাছে পরাজয়ের গ্লানিতে আত্মহারা হয়ে উঠল। কি করে শোধ নেওয়া যায় তা ভেবেই সারা সন্ধ্যা গেল কেটে।

নতুর যাওয়া হয়নি।

মমতাময়ী সম্মতি দেয়নি। প্রাণদাচরণের একান্ত অনিচ্ছা ছিল না কিন্তু মমতাময়ীর মেয়ে বলল, আর একটা বছর তুমি সংসারটা চালিয়ে নাও কাকাবাবু, তারপর যা করবার আমি করব। নতুকে এম-এ পাশ না করিয়ে আমি ছাড়ব না।

ছুটি ফুরিয়ে যেতেই মেয়ে আবার ফিরে গেল হোস্টেলে। যাবার দিন রিক্সায় বসেই দেখতে পেল অজিত বারিক রাস্তার ধারের জানলায় বসে

তার দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিল মমতাময়ীর মেয়ে। কেমন মায়া বোধ করে আবার মুখ ফিরিয়ে দেখল। অজিত সেই আগের মতই চেয়ে রয়েছে দেখে সে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকল। মনে হল সেদিন অজিতের মুখের ওপর ওভাবে দরজা বন্ধ না করলেই ভাল হত। কেন বা অজিতকে সে মার্জনা করতে পারেনি। কেন, তা সে নিজেও হয়ত জানে না।

দিন পনের পরে অচেনা হাতের লেখা অন্তর্দেশীয় পত্র পেয়ে বিস্মিত হল মমতাময়ীর মেয়ে। প্রেরকের নামের বদলে কতকগুলো নম্বর আর ব্যাঙ্গালোর লেখা। অনুমানে বুঝল চিঠিখানা অজিতের। খুলবে কি খুলবে না ভাবতে ভাবতে খুলেই ফেলল পত্রখানা।

পত্রে কোন সম্বোধন নেই। তলায় স্বাক্ষর রয়েছে অজিত।

ক্রোধে ফেটে পড়ল মমতাময়ীর মেয়ে। মুখচোখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। একবার চিঠিখানা সোজাসুজি ধরে ছিঁড়বার উচ্ছাস করেই থেমে গেল। পড়ল চিঠিখানা :

> অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। বোধহয় ঠিকানা ভুল হবে না। সর্বপ্রথম নিবেদন। চিঠিখানা না পড়ে ছিঁড়ে ফেল না। কেন না অন্যায় কিছু এতে নেই। অশালীন কিছু লিখবার ইচ্ছে নিয়েও এ পত্র লিখছি না।
>
> যেদিন তুমি হোস্টেলে ফিরে যাচ্ছিলে সেদিন আমি জানলায় বসেছিলাম, দেখছিলাম তোমার চলে যাওয়া। আজ আমার চলে যাওয়ার দিন। তাই মনে পড়ল তোমাকে। আজ ভাবছি কেন ওখানে বসেছিলাম। জানি না, তোমাকে যেতে দেখে মনে হল সেদিনের কথা কাটাকাটির কথা। কথার দাম খুব ছিল না, কিন্তু তোমার মুখভঙ্গীর দাম ছিল বেশি। তাই তোমার যাবার সময় কথা কাটাকাটির কেমন একটা লোভ জেগেছিল। ভেবেছিলাম ছুটে গিয়ে কবির ভাষায় বলি, 'যেতে নাহি দেব'। নেহাৎ মাটির জগতে বাস করি বলেই তা পারিনি, তবে সেই দিনটা ভুলতে পারিনি।
>
> সেদিন আমার বক্তব্য খুব সুখের হয়নি, সেজন্য আজ মাপ

চাইছি। তার জন্যই এই পত্র। মার্জনা পাব আশা করছি।

ইতি—অজিত।

মমতাময়ীর মেয়ে দু-তিনবার পড়ল পত্রখানা। তারপর ভাঁজ করে সুটকেশের তলায় রেখে দিল। সেদিন ছিল নাইট। রাত জেগে সে ভাবল ঐ চিঠির কথা। অজিত কেন ঐ পত্র দিয়েছে! কি লাভ তার। কি ধৃষ্টতা! একটা ছল করে অপর মেয়েকে পত্র লেখা অমার্জনীয় অপরাধ। উত্তর পাবার প্রত্যাশা নিশ্চয়ই করেনি সে। তাকে উত্তর না দিলে অভদ্রতা করা হবে। দিতে হবে কঠিন উত্তব। তাহলে ভবিষ্যতে আর চিঠি সে লিখবে না। রাতের ডিউটি শেষ কবে এসেই সে আবার বের করল পত্র-খানা। আবার পড়ল। কেমন সুন্দর মনে হল অক্ষরগুলো। তাই তো!

মমতাময়ীর মেয়ে পত্র লিখল অজিতকে :

তোমার চিঠি পেলাম। অনাহূতভাবে এমন পত্র লেখা তোমার উচিত হয়নি। তোমার সাথে আমার এমন কোন হৃদ্যতা নেই যে তুমি পত্র লিখবে। কে তোমাকে পত্র লিখবার সাহস দিয়েছে! ক্ষমা চাইবার ভনিতা করে পত্র লেখা মোটেই রুচিসঙ্গত মনে করি না। তুমি ভুলতে পারনি,আর তোমার কথা মনে হলেই আমার সারা শরীর রি-রি করে ওঠে।

ইতি—খুকি।

মমতাময়ীর মেয়ে মনে করেছিল এরপর আর অজিতের কোন পত্র আসবে না। তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে অজিতের দ্বিতীয় চিঠি এল কয়েকদিন বাদেই।

এইভাবে দুজনের পত্রাঘাত চলতে চলতে পত্রালাপে পরিণত হল। মমতাময়ীর মেয়ের অজান্তে তার মনে অজিত বারিক দানা বেঁধে বসল। অজিতকে মন থেকে মুছে ফেলতে যতই সে চেষ্টা করেছে অজিত যেন ততই তার মনের সাথে লেপ্টে গেছে। সপ্তাহান্তে অজিতের পত্রের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকত। পত্র পেতে দেরি হলে বারবার নিচের তলার ডাকবাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে পিওনের জন্য। আবার ফিরে এসে নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করেছে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। অজিতের চিঠি বাক্সের তলায়

অনেকটা স্থান জুড়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে পুরানো চিঠি বের করে পড়ে, পড়ে হাসে, কখনো রাগের মাথায় নিজেই সেগুলো অগোছালো করে রাখে। ট্রেনিং শেষ হবার আগে অজিতের চিঠি পেল। সে লিখেছে, তোমার তেজস্বিতা ও ভাবগাম্ভীর্যকে কেমন যেন ভালবেসে ফেলেছি।

মমতাময়ীর মেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখল, তেজস্বিতা আর ভাবগাম্ভীর্যকে ভালবেসেছ, আমাকে নয়? যার গুণাবলী ভালবাস তাকে ভালবাসতে বুঝি পারনি?

চিঠির উত্তর আসার আগেই মমতাময়ীর পত্র পেল তার মেয়ে। মা লিখেছে: তুমি কবে আসবে, কোথায় পোস্টিং হল,—কিছুই জানাওনি, নতু বরানগরের একটা মিলে কাজ পেয়েছে। সে যাবার আগে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। আগামী মাসের বাইশ তারিখে অজিতের বিয়ে। তার মা তোমাকে বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে বলেছে। ধীরাজ চট্টরাজের মেয়ে সবিতার সাথে অজিতের বিয়ে। গেল বছরই বিয়ে ঠিক হয়েছিল, এবার সেটা সমাধা হবে।

আর পড়তে পারল না মমতাময়ীর মেয়ে। চমকে উঠল সে। ধীরাজ চট্টরাজের মেয়ে সবিতার সাথে অজিতের বিয়ে। সেই কদাকার মেয়েটার সাথে বিয়ে। নিশ্চয়ই লাভ্ ম্যারেজ! কিন্তু একবছর আগে যার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে একটা বছর ধরে অভিনয় করে চলেছে তার সাথে। অজিত কঠিন প্রতিশোধ নেবার ফন্দীতে যে ছিল তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না। কেন অজিত তাকে এভাবে ঠকালো, কেন সে তাকে সহজভাবে তা বলল না। অভিমান ও আক্রোশে ভেঙ্গে পড়ল সে।

অজিতকে চিঠি লিখল মমতাময়ীর মেয়ে: শুনলাম তোমার বিয়ে। ভালবেসে বিয়ে করছ নিশ্চয়ই। আমিও তো তোমাকে ভালবেসেছি। কৈ, আমাকে তো বিয়ে করতে চাওনি। আমার ভালবাসা বুঝি পেতে চেয়েছ, তোমার ভালবাসা বুঝি দিতে চাওনি। কি নিষ্ঠুর তোমার অভিনয়।

উত্তর দিল অজিত বারিক: আমিও তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসলেই বিয়ে করতে হয় এমন কথা জানতাম না। তোমাকে ভালবাসা যত সহজ, বিয়ে করে ঘর সাজানো তত সহজ নয়। তোমার অতীত জীবনের পরিচয় পতাকার মত যখন আগে আগে ছুটবে, আমি তখন

জবাব খুঁজে পাব না। তোমার পরিচয়ে আমার জীবন গ্লানিময় করতে পারব না।, ভগবান এ লজ্জা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

চিঠিখানার ভাষা মমতাময়ীর মেয়ের সর্বাঙ্গে হিমানীর পরশ বুলিয়ে দিল, ছুটে গেল তার স্বপ্ন। বাক্স খুলে টেনে বের করল অজিতের সব চিঠি। দেশলাই জেবলে পুড়িয়ে দিল সবগুলো। চিঠির ছাই জুতো দিয়ে ডলে গুঁড়ো করে নিশ্চিন্ত মনে বসল মমতাময়ীর মেয়ে।

রুটিন বাঁধা জীবনের কোন ব্যতিক্রম নেই কোথাও। দেওয়ালের কালেণ্ডারটি উল্টে রেখে নিজের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ভুলতে চাইল সব কিছু। মনের সাথে সংগ্রাম করতে করতে নিজের ওপরই ঘৃণা জন্মাল। মায়ের উপদেশ ভুলে যে অপরাধ করেছে তার জন্য অনুশোচনায় মরমে মরে গেল মমতাময়ীর মেয়ে। সে ভাল করে বুঝল, তাকে অপমান অপদস্থ করতেই এই চাল চেলেছিল অজিত। অসহায় দুর্বল মানুষের ওপর সুযোগ বুঝে যে আঘাত করেছে, সে আঘাত বুমেরাং-এর মত ফিরিয়ে দিতে না পারলে তার সব সাধনা-ই ব্যর্থ হবে।

এসে গেল শেষ পরীক্ষার দিন। পরীক্ষা শেষ করে মাকে লিখল: আজ পরীক্ষা শেষ। পাশ করব নিশ্চয়ই। আগামী সপ্তাহে পোস্টিং-এর আদেশ হয়ত পাব। আদেশ পেলেই দেখা করতে যাব।

আঙ্গুল গুণে দেখল সেদিন ঊনিশ তারিখ। সে বাড়ি ফিরবার আগেই অজিতের বিয়ের পর্ব শেষ হবে। কোন অশান্তির কোন সম্ভাবনা কোথাও থাকবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে অজিতের মুখ সে দেখবে না।

তবুও মুখ দেখতে হয়েছিল।

পোস্টিং অর্ডার পেয়ে মমতাময়ীর মেয়ে ফিরে এল মায়ের কাছে। এতদিন ছিল শিক্ষাকাল, এবার আরম্ভ হবে কর্মজীবন। কর্মজীবনের বিরতি সামান্য তাই পাড়ায় ঘুরে ঘুরে সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেল। কারও দেখা পেল, কারও নয়। কারও বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ উঠছে শিক্ষার উঁচু স্তরে, কেউ গেছে বিদেশে। ঘুরতে ঘুরতে এল সবিতার বাড়িতে। সবিতার নতুন সাজ, নতুন রূপ। ভালই লাগল তাকে। সোজা টানা লাল সিঁদুরটা তার শোভা বৃদ্ধির সহায়, বসে বসে গল্প করল। সবিতার সব কথার মাঝেই অজিতের প্রশংসা।

মমতাময়ীর মেয়ে অজিত প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে, জমল না তাদের কথোপকথন। উঠছিল মমতাময়ীর মেয়ে। পাশের ঘর থেকে চেনা গলার শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। সবিতাকে জিজ্ঞেস করল, অজিতদা আছে বুঝি?

সবিতা হেসে বলল, হ্যাঁ। কালকে দুজনেই যাব ওদের বাড়ি।

অজিতেরই গলা। শোনা গেল অজিতের মন্তব্য, "শিবনাথের মেয়ে এসেছে, ওর বাবার নাম প্রাণদাচরণ।

সবিতা শুনতে পায়নি, শুনেছে মমতাময়ীর মেয়ে। শোনামাত্র মুখখানা কালো হয়ে গেল। একবার তার মনে হল, ছুটে গিয়ে পা দিয়ে অজিতের মুখটা থেঁতলে দেবে। কি ভেবে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তখনও অজিতের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। সে বলছিল, জান, মেয়েটা আমাকে প্রেমপত্র লিখত। লজ্জাসরমের বালাই নেই ওদের।

আর শুনতে পারছিল না মমতাময়ীর মেয়ে। ছুটে পালিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তায়। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল। কোন রকমে ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢুকেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ছটফট করতে থাকে। নিজের মূঢ়তার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়। পরিণত বুদ্ধির মানুষ অসহায়কে উৎপীড়ন করে, যুবক মন এ উৎপীড়নকে প্রতিরোধ করে। আর যুবক অজিত এই উৎপীড়নকে মূলধন করে ব্যঙ্গ করছে তার অসহায় অবস্থাকে। এত নিচ যে সে হতে পারে তা মমতাময়ীর মেয়ে ভাবতেও পারেনি।

কাজে যোগ দেবার দিন এগিয়ে এল।

প্রাণদাচরণ কিনে আনল নতুন বাসনপত্র, সাজসরঞ্জাম। তার মেয়ে যাবে কর্মক্ষেত্রে, নতুন সংসার পাতবে বিদেশে বিভূঁইয়ে। মমতাময়ীর মেয়ে মনের আনন্দে জিনিসপত্র গুছিয়ে সকালবেলায় সবেমাত্র সদরদরজা খুলে দাঁড়িয়েছে, তার চোখ পড়ল খবরের কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে লেখা অসংখ্য পোস্টারের দিকে। তার মায়ের নামের সাথে প্রাণদাচরণের নাম আর তার নিজের নামের সাথে অজিতের নাম যুক্ত করে কে বা কারা পোস্টার সেঁটে দিয়েছে পাড়ার অলিগলি সর্বত্র! ধরাস্ করে দরজা বন্ধ করে ছুটে পালিয়ে এল সে। ভূত দেখে মানুষ যেমন নাড়ীছাড়া হয়, মমতাময়ীর মেয়ের অবস্থাও তদ্রূপ। এক চুমুকে

কে যেন শুষে নিল মুখের রক্ত, চোখে ফুটে উঠল ভীতির চিহ্ন, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পেল বৃদ্ধি। মমতাময়ীর মেয়ে অসারের মত দাঁড়িয়ে রইল রান্নাঘরের দরজা ধরে।

মমতাময়ী মেয়ের আতঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, কি হয়েছে খুকি?

শুষ্ককণ্ঠে মেয়ে বলল, পোস্টার!

কোথায়? কিসের?

বাইরে গিয়ে দেখ।

সবাই দেখল। সবাই মাথা নিচু করে ফিরে এল নিজেদের ঘরে। কারও মুখে কোন কথা নেই। আগামীকাল সকালে মমতাময়ীর মেয়ে যাবে নতুন কর্মক্ষেত্রে তার সূচনায় এই কলঙ্ক। তার যাওয়া বন্ধ বুঝি হয়ে যায়। সবাই যখন গালে হাত দিয়ে ভাবছে তখন উঠল মমতাময়ীর মেয়ে। বিছানা থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সদর খুলে বেরিয়ে গেল। সোজা অজিতের ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, কেন তুমি পোস্টার মেরেছ অজিতদা?

আমি! অজিত বাধা দিল। কিসের পোস্টার?

কিসের পোস্টার তুমি জান না। তোমার জানলা খুললে যা দেখা যায় তা তুমি দেখনি। তোমার হাতের লেখা আমি চিনি। এসব পোস্টার তোমার লেখা।

আমি নই।

নিশ্চয়ই তুমি। কে জানে আমি তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলাম? আমি আর তুমি ভিন্ন এ কথা কে জানে? তোমার সাথে আমার নাম জড়িয়ে তুমি আড়ালে থাকতে চেয়েছ, এই তো। মমতাময়ীর মেয়ের চোখ ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি অজিতদা। আমার মা-ও তোমার দুয়ারে ভিখিরি সেজে আসেননি। কেন এভাবে অপমান করলে? কেন, কেন?

আমি নই খুকি!

ন্যাকা! তুমি নও। এখনও মিথ্যে বলছ। কলঙ্ক তো আমার। তুমি সত্যি কথাটা বললে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না, আঘাত করলে প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তুমি রেহাই পাবে না,

একদিন এর কৈফিয়ত দিতে হবে নতজানু হয়ে। বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। নিজের ঘরে ঢুকে চোখ মুছে শক্ত হয়ে বসল।

মমতাময়ী ধীরে ধীরে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলি খুকি ?

অজিত বারিকের বাড়িতে।

কেন ?

কেন যাব না, সেইতো এসব করেছে। তার কাছে জানতে গিয়েছিলাম, কেন সে এমন করে আমাদের পেছনে লেগেছে। আমরা তো তার কোন ক্ষতি করিনি।

করেছি বইকি। সে ক্ষতি তুই বুঝবি না। যারা অপরকে ভিক্ষা-পাত্র হাতে দেখলে খুশি হয় তারাই কাউকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেখলে হিংসায় ফেটে মরে। এই তো আরম্ভ। শেষ যে কোথায় তা ভগবানই জানেন। মন শক্ত করে সংসারে পা ফেলতে হয়। ঘাত প্রতিঘাত আসবেই, সইবার ক্ষমতা যেন হারাস নে, তা হলে চলতে পারবি না।

মেয়ে চুপ করে বসেই ছিল, হঠাৎ বলে উঠল, আমার যাবার জোগাড় করে দাও মা। আমি আজই বিকেলে যাব। আর একদিনও এখানে থাকব না।

আজই ! আবেকটা দিন পরেই না হয় যেতিস। পরিবেশটা একটু শীতল হত !

শীতল নয় বলেই তো যাব। হয়ত যেতাম না আজ। কাল বিকেলেই যেতাম। কিন্তু পোস্টারগুলোর মাঝ দিয়ে আমি পায়ে হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠব। সবাই দেখুক, জানুক, কাদা ছুঁড়ে দিলে সে কাদায় আমরা কর্দমাক্ত হই না। তুমি ব্যবস্থা কর মা।

মমতাময়ী অনিচ্ছার সাথেও মেয়ের যাবার জোগাড় করে দিল।

বিকেলবেলায় মমতাময়ীর মেয়ে হেলে-দুলে নতুর সাথে হাসতে হাসতে পোস্টার ঘেরা পাড়ার পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল রেলস্টেশনের দিকে। একবার ফিরেও তাকাল না। কোথাও কোন লোক তাদের চলাকে উপলক্ষ্য করে কিছু বলছে কিনা তাও শুনতে তারা কান পাতেনি। কেউ অশ্লীল ইঙ্গিত করলেও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে পথ বেয়ে চলে গেছে, সে ইঙ্গিত শুনতে এক লহমাও ব্যয় করেনি।

পাঁচ

অনেকটা পথ একাই আসতে হয়েছে। ট্রেন ছেড়ে স্টীমার। তারপর বাস। এমনি করে আড়াইশ' মাইল পথ পেরিয়ে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিল মমতাময়ীর মেয়ে। অবশেষে তীর চিহ্ন দেওয়া মেঠো পথ ধরে মমতাময়ীর মেয়ে কণা মজুমদার জয়েনিং রিপোর্ট দিল কাজলদীঘির স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সামনে বিরাট সাইনবোর্ড 'কাজলদীঘি হাসপাতাল' দুখানা কাঠের খুঁটির মাথায় পেরেক ঠোকা। হাসপাতালের বারান্দায় বাক্স-বিছানা রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ডাক্তার সেনের সাথে দেখা করে এল নিজের বাসস্থানে। সেদিন কোন ডিউটি করতে হয়নি, নিজের বাসস্থান সাজিয়ে-গুছিয়ে কণা বের হল পরিচয় করতে।

পরপর ছ'টি নার্সের কোয়ার্টার। সামনে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির বুকে কালো জলের ঢেউ। পাড়ের ওপর সারিবদ্ধ আমের গাছ। এক-ধারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি তালের গাছ। দীঘির উল্টোদিকে ক'ঘর গ্রাম্য চাষীর বসতি। দীঘির পাড়েই হাসপাতাল। দীঘির নাম থেকেই গ্রামের নাম, গ্রামের নামেই হাসপাতাল। দীঘি পেরিয়ে খোলা ধানক্ষেত, কোথাও শ্যাওড়া ঘেঁটুর ঝোপ। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে হাসপাতালের পেছনে, হাসপাতালের ছায়া পড়েছে দীঘির বুকে। ছবির মত সুন্দর। কণা ধীরে ধীরে দীঘির কিনারা ধরে ঘুরে আসতে আসতেই সূর্য গেল ডুবে। ফিরে এসে জ্বালাল হ্যারিকেন। কদিনের পথ শ্রান্তিতে ইচ্ছা হচ্ছিল না আবার রান্নার জোগাড় করে। সঙ্গে এক কৌটা মুড়ি ছিল। আজ রাতটা মুড়ি খেয়ে কাটাবে স্থির করে জানলা খুলে শুয়ে পড়ল।

দরজা ঠেলে ঢুকল এলিস করিম ঘোষ।

আপনি আজ এলেন বুঝি? জিজ্ঞেস করল এলিস।

হাঁ।

ট্রান্সফার?

না। প্রথম পোস্টিং।

বড়ই ক্লান্ত। আচ্ছা কাল আসব।

না, না। বসুন। আপনি ?

আমিও আপনার মত স্টাফ নার্স। আমার নাম এলিস করিম ঘোষ। আমাকে এলিস বলবেন। তা হলেই হল। সবাই বলে। আপনার রান্নার জোগাড় দেখছি না, খাওয়া-দাওয়ার কি হবে ?

কণা অনিচ্ছার সাথে বলল, আজ রাঁধবার ইচ্ছা নেই। শরীরও চলছে না। মুড়ি খেয়েই রাত কাটাব।

ইতস্তত করে এলিস বলল, যদি সাহস দেন তা হলে একটা কথা বলব।

ভয় কিসের। বলুন।

আমার ওখানে চাট্টি এবেলায় খাবেন। ভয় তো নয়, ভরসাও ঠিক পাই না। আমার তো কোন জাত নেই। আমার হাতে খেতে আপনার যদি আপত্তি থাকে তাই ভাবছিলাম।

ওঃ। হাসল কণা। বলল, আপনার জাত নেই, আমার জাতের বালাই নেই।

আমার সাথে যারা ট্রেনিং-এ ছিল তারাও এই কথাই বলত। এখানে দেখছি আমার হাতে জল খেতে চায় না অনেকেই। তাই ভরসা করে বলতে পারছিলাম না।

রুগীরা তো খায়।

বাধ্য হয়ে। জেনে-শুনে কেউ হয়ত খেত না। আমার মা মেরী ছিলেন খাঁটি কৃশ্চান। বিয়ে করেছিলেন বাড়ির বাবুর্চি করিমকে। দাদামশায়-দিদিমা খেপে উঠল। শেষ পর্যন্ত করিমকে তাড়াল তারা। যাবার বেলায় করিমের উপহার এই এলিস। আমার বেলায় ঘটল উল্টো। মা বললেন, আমি কৃশ্চান। বাবাকে দেখিনি। শুনেছি তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলমান। অবশ্য তাঁদের বিয়ে হয়েছিল চার্চে। আমি ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে এসে বিয়ে করলাম হিন্দুকে। বলেই মৃদু হাসল এলিস। হাসিতে গর্ব ও সৌভাগ্য দুটোই ফুটে উঠল।

কথা ভাল হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, এই বিয়েতে আপনার মনের অথবা দেহের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি ?—রাগ করবেন না, কথার কথা, তাই জানতে চাইছি।

মোটেই না। কৃশ্চান এলিস আর মুসলমান করিমের সাথে হিন্দু ঘোষের যে স্টক্ মিক্‌শ্চার হয়েছে তা কিছুটা তেতো হলেও অপেয় নয়।

কণা হেসে ফেলল।

হাসছেন।

হাসবারই কথা। কেমন সহজ সরলভাবে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত বললেন। তাতে আনন্দের হাসি না হাসলে অপরাধ হবে। একটু যেন complex হয়ে পড়েছেন। জন্মটাই মানুষের বড় কথা নয়। কর্ম দিয়েই মানুষের পরিচয়। সে পরিচয়ে যে হীন তার কোন পরিচয় নেই। আপনি জানেন না আপনি কে। মা যীশু ভজতো, বাবা ভজতো আল্লা। আপনার স্বামী ভজেন ব্রহ্মকে। আর আপনি যে কি ভজেন তা আপনি জোর করে বলতে পারেন না। অথচ আপনি নিজেকে ছোট মনে করে অপরের মুখে একগ্রাস ভাত তুলে দিতে ইতস্তত করেন। complcx নয় কি?

হয়ত তাই। আমিও ভজনা করি। আমি ভজনা করি মানুষকে। নিজের স্বামীকে, সন্তানকে আর যাদের সেবার জন্য এখানে এসেছি তাদের ভজনা করেই এ জীবনটা কাটিয়ে দেব মনে করেছি। আমার ভজনার শেষ হবে না। কারও বিশ্বাসে আঘাতও লাগবে না।

কণা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন আপনার কোয়ার্টারে। ওখানে বসে গল্প করব আর আপনি আমার জন্য রান্না করবেন। তারপর দুজনে এক থালায় বসে খাব। কেমন!

কণা যে এলিসের ঘরে খেয়ে এসেছে এ সংবাদ প্রচার হতে দেরি হয়নি। পরদিন কণা নিজেই সবাইকে বলেছে। স্বমুখে যা স্বীকার করেছে তা যে মোটেই মিথ্যে নয় তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করল। প্রতিবেশি স্টাফ নার্সরা গোপনে মেট্রন মিস্ অধিকারীকে সংবাদটা শুনিয়েছিল। মিস্ অধিকারী এতে মোটেই আগ্রহ দেখায়নি। এটা যে ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার তাও বলেছিল। তবুও দুজনের মুখভার হল। তারা কণাকে মোটেই মনের সাথে গ্রহণ করতে পারল না। তাদের সাথে তাল ঠুকতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে তারা বুঝিয়ে দিচ্ছিল কণা অন্যায় করেছে। কেউ বলল, এলিসের দোষ। সে সব খবর গোপন করে কণাকে ডেকে নিয়ে গেছে। কেউ বলল, ওটারও জন্ম বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই

কিছু ঘোরালো। আর কণা সবাইকে বলেছে, সে জেনে শুনেই এলিসের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, ঠকাবার কোন প্রশ্নই তার ছিল না। আর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে সে নিজেও মাথায় ঘামায় না।

চারজন স্টাফ.নার্সের দুটো দল হয়ে গেল, বাকি রইল মেট্রন আর আরতি দাস। আরতি জাতিতে অন্ত্যজ। নার্স হলেও হাসপাতাল ডিউটি নেই, তার কাজ ফিল্ডে। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকতে হয়। বিকেলবেলায় ফিরে এসে রান্নাবান্না তারপর দিবা নিদ্রা। নিজের আস্তানার বাইরে তাকে দেখাই যায় না প্রায় দিনই। সেই রয়ে গেছে দলহীন হয়ে। কণা যেমন মাঝে মাঝে আরতির ঘরে বসে গল্প জমায় তেমনি যায় দীপালী আর সুচরিতার ঘরে। কারও কোন ভাল মন্দই সে আলোচনা করে না, বরং ফিল্ড ওয়ার্কের মজার মজার অভিজ্ঞতা শুনে আসে আরতির কাছ থেকে।

জীবনযাত্রাকে সহজ সরল করবার চেষ্টা করতে চায় কণা। যারা যারা তাকে দূরে ঠেলে দিতে চায় তাদেরই আপন করতে চায় সে। উপযাচক হয়ে সবার কাছে যেত, যদিও জানত তাদের কাছে সে সহজে স্নেহ ও শ্রদ্ধা আদায় করতে পারবে না। তবুও সে তাদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। অভিযোগহীন মনটা নিয়ে হেসে খেলে সবার সাথে একাত্ম হয়েই থাকতে চায়।

এমনি করে কটা মাস কেটে গেল, আঘাত পেল, অপরোক্ষে অপমানকর উক্তি শুনল, তবুও সে হাল ছাড়ল না। হয়ত আরও কিছুকাল এই দ্বন্ধ চলত, সে দ্বন্ধের অবসান ঘটল আপনা থেকেই।

অনেক রাতে সুচরিতা এসে চুপি চুপি ডাকল কণাকে। এলিস গেছে নাইট করতে, তার ছেলেটা কণার কোলের কাছে ঘুমোচ্ছিল। সুচরিতার ডাকে ধর্মর করে উঠে বসেই উত্তর দিল।

দরজা খোল কণি।

দরজা খুলতে খুলতে কণা বলল, কি হয়েছে সুচিদি?

দীপা বমি করছে। তুই একটু ওর কাছে বস, আমি ডাক্তার সেনের কাছে যাব।

বমি। কি খেয়েছিল?

তা কিছু বলছে না।

চল, আগে দেখে আসি। বলেই সুচরিতার সাথে কণা হাজির হল দীপাদির ঘরে।

দীপাদি। ডাকল কণা।

উঁ।

বমি কেন হচ্ছে? কি খেয়েছ আজ?

কেন হচ্ছে জানিনা। ক্লান্তিতে দীপাদি চোখ বুঁজে রইল। কি যেন বলতে চেয়ে মাথাটা উচুঁ করতেই আবার শুরু হল বমি। কণা বমির ধরনটা ভাল করে দেখে সুচরিতাকে বলল, আর ডাক্তার সেনের কাছে গিয়ে কাজ নেই সুচিদি।

কেন রে?

কেন তা জান না। এত রুগী দেখলে আর নিজেদের বেলায় ভুল করছ।

মানে?

মানে দীপাদিকে জিজ্ঞেস কর।

দীপালি বিস্ফারিত নেত্রে কণার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমাকে বাঁচাও কণা।

গম্ভীরভাবে কণা বলল, বাঁচার রাস্তা যে বন্ধ করে রেখেছ দীপাদি। আমরা অপরকে পরিবার পরিকল্পনা শেখাই আর নিজেদের বেলায় অন্ধ হয়ে থাকি। প্রদীপের তলায় অন্ধকার কথাটা খুবই সত্যি।

এতকাল সাবধানই তো ছিলাম। কেন যে কি হল! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল দীপালি।

কণা ফিরে এল তার ঘরে।

সারারাত ঘুমোতে পারল না। এলিসের ছেলেটা পাশ ফিরে শুতেই এলিসের কথাগুলো ভাল করে মনে হল তার। যারা এলিসের জাত নিয়ে ঘোঁট পাকায় তাদের মুর্খতার পরিচয় এমন অসতর্কতার মাঝ দিয়ে যে কোনদিন প্রকাশ পাবে তা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। জীবনের প্রয়োজনগুলো মেটাতে যারা সুরঙ্গপথে চলতে চায় তারা এমনি করেই হোঁচট খায় নিজের অজান্তে। সহজ সরলভাবে যারা চলে তারা এলিসের মত সংসার পেয়েও খুশি হয়। জীবনের সবকিছু উপলব্ধিকে আপন করে নিতে পারে।

সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে সোজা বেরিয়ে পড়ল মাঠের আইল ধরে। শ্যাওড়া আর শিমুলের ঝোপ সামনে। পাশ দিয়ে স্বল্প পরিসর পীচের রাস্তা চলে গেছে বড় রাস্তার দিকে। নির্জন পথ ধরে চলতে চলতে সাঁওতাল পল্লীতে এসে উঠল কণা। তার তিন মাসের কর্মজীবনে পরিচয় হয়নি বাইরের লোকের সাথে, পরিচয় হয়েছে শুধু সাঁওতাল রমণীদের সাথে। তাদের সহজাত সরমভরা ভাব অথচ বলিষ্ঠ চলাচল ও সরলতা মুগ্ধ করেছে তাকে। সভ্যতার স্পর্শ ওদের কম। তাই বোধহয় ওরা সহজ সরল করতে পেরেছে নিজেদের জীবনধারাকে। গ্লানি নেই, ক্লান্তি নেই। সামান্য পেলেই ওরা অনেক পায়। সেই পাওয়ার আনন্দে কৃতজ্ঞতা জানায়। এই আনন্দ প্রকাশ পায় নারী-পুরুষের সমবেত নাচ ও গানে। সে সময় মনে হয় ওরা সকল সুখ-দুঃখের অনেক ঊর্ধ্বে।

সাঁওতাল পল্লীতে এসেই তার বিগত তিন মাসের জীবনকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। অতীতকে সে ভয় করে। বর্তমানকে সে সহজ করতে চায়। চেয়ে থাকে ভবিষ্যতের সুদিনের আশায়। বর্তমানকে সুন্দর করেছে ঐ সাঁওতালদের অযাচিত ভালবাসা, সে ভালবাসা বিনিময় চায়নি তাই বিস্বাদও মনে হয়নি।

সাঁওতাল পল্লীর বুক চিড়ে রাস্তা গেছে বড় সড়কের দিকে। দুটো রাস্তার সঙ্গমস্থলে এসে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে ছটা বাজতে আর দেরি নেই। সাতটা থেকে তার মর্নিং আরম্ভ। সারারাত না ঘুমিয়ে সকালের মিঠে বাতাসে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। ফিরতে ইচ্ছে ছিল না, তবুও ফিরতে হল। সাতটায় মর্নিং, কর্তব্যের কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে আসছিল স্নেহলতার কথা। সেই তাকে বলেছিল, তার বাবা তাকে মানুষ করতে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে রাস্তার মাটি কেটে মাথায় করে বয়ে নিয়ে গেছে। তার বাবা জানত, একটা মেয়ে দাঁড়ালে সবাই দাঁড়াবে। স্নেহলতা দাঁড়িয়েছিল। সে দায়িত্ব পালন করতে জীবনের সব স্বাদ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে সম্বল করেছিল কৃচ্ছ্রতা। কিন্তু কণার বাবা কি এটা করতে পারত না। তার বাবাও তো একজনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে বিদায় নিতে পারত তা হলে অভিযোগ থাকত না তার। আজ তাকে পেটের দায়ে তিনশ

মাইল পথ পেরিয়ে আসতে হত না। আসতে হত না এই নির্জন বনবাসে। শেষবারের মত বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল তার দায়িত্ব সে পালন করবে কি না! যদি দায়িত্ববোধ নিয়ে বাবা এসে দাঁড়াত তার পাশে তাহলে নার্সিং পড়তে তাকে যেতে হত না। নতুন উদ্দীপনায় পাঠ্য-জীবনকে টেনে নিয়ে চলত, নতুন জীবনের স্বাদ সে পেত। তা আর হল না। শিবনাথের প্রস্তাব ছিল অবান্তর। সে প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য। অনিমা দত্তকে মা বলে গ্রহণ করা আর নিজের গলায় ফাঁসি দেওয়া একই কথা। আর নিজের মাকে বিচ্ছেদের উপদেশ দেওয়া আর বিষ খাওয়া একই কথা। এই মর্মবেদনা অনুভব করতে পারেনি শিবনাথ।

ভাবতে ভাবতে চলছিল। চলতে চলতে কখন যে পথ ফুরিয়ে গেছে টেরও পায়নি। তার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট শিমুল গাছ, সেই শিমুল গাছের তলায় এসে হুঁস ফিরে এল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল। এখনও বিশ মিনিট দেরি রয়েছে সাতটা বাজতে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পোশাক বদল করতে লাগল। এলিসের ছেলে তখনও ঘুমোচ্ছে। এলিস আসবে এখুনি। সে গেলেই এলিসের ছুটি। ফিরে এসেই এলিস ব্যস্ত হবে তার সন্তানের পরিচর্যা করতে। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে ছুটে চলল হাসপাতালের দিকে। গিয়েই ফেরত পাঠাবে এলিসকে।

এলিস তখনও কাজে ব্যস্ত। কণা গিয়ে ডাকল, ঘোষদি।

কেন ভাই।

তোমার ডিউটি শেষ। ঘরে যাও। খোকা এখনও ঘুমোচ্ছে।

কোথায় গিয়েছিলি সকালে?

কেন?

যেতে দেখলাম কি না!

মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। রাতের বেলায় কেন যে ঘুম হল না। তাই সকালের মিঠে বাতাসে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

শুনলাম দীপার শরীর ভাল নেই। নাইট বোধহয় তোমারই পড়বে। আমি গিয়ে রান্নাটা করছি। তোমাকে আর রান্না করতে হবে না। দুপুরে সুচিদি এলেই ছুটে গিয়ে খেয়েদেয়ে টানা ঘুম দিও। নইলে রাত কাটবে না।

কণা এলিসের পরামর্শকে মেনে নিয়ে কাজে হাত দিল। রুগীদের

চার্টগুলো পরীক্ষা করে দেখল। যাদের ওষুধ দেবার তাদের ওষুধ দিল। দেহের তাপ দেখে লিখে রাখল।

নার্স। ডাক শোনা গেল ডাক্তার সেনের।

ইয়েস স্যার বলেই ধীরে ধীরে কণা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের সামনে।

আট নম্বরের সাঁওতাল মেয়েটার কাল ডেলিভারি হয়েছে। বেবিটা খুবই সিকলি। বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। এখানে অক্সিজেনও নেই। সদরে গাড়ি পাঠাচ্ছি অক্সিজেন আনতে। তুমি সঙ্গে যাও, আরও কটা খুঁটিনাটি ওষুধপত্তর আনতে হবে। তোমার অসুবিধা হবে কি!

না, অসুবিধা হবে না।

তা হলে রেডি হয়ে নাও। কেরানীবাবুকে ডেকে বলল, মিস্ মুখার্জিকে কল্ দিন। মিস্ মজুমদারের ডিউটি সে করবে।

কণা দাঁড়িয়ে গেল।

কিছু বলবে!

বলছিলাম কি, মিস্ মুখার্জির শরীরটা মোটেই ভাল নয়। কাল রাতে আমি তাকে attend করেছি। আজ আর তাকে কাজ না দিলেই হত।

ডাক্তার সেন মাথা নিচু করে কি ভাবল।

মিস্ দাসের তো ফিল্ডওয়ার্ক বন্ধ রয়েছে, ডাক্তার হোসেন না আসা অবধি তার কোন কাজ নেই। মদনবাবু মিস্ দাসকে খবর দিন।

কণা কয়েক পা এগোতেই ডাক্তার সেন তার পিছু পিছু এসে জিজ্ঞেস করল, মিস্ মুখার্জির কি অসুখ বলতে পার? আমাকে তো কোন খবর দেয়নি। ওষুধপত্তরও তো খায়নি।

কণা মাথা নিচু করে বলল, ওষুধে উপকার না হয়ে অপকারও তো হতে পারে।

ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।

বুঝে কাজ নেই। ওটা পুরুষের বুঝবার দরকার হয় না।

ওঃ। Is it a fact?

সেটা মিস্ মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করবেন।

কণা সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল। নামতে নামতে ডাক্তার সেনের মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, এরজন্য দায়ী কে?

কণার মনেও এই প্রশ্ন জেগেছে। এই ভার্জিন মাদার হবার পেছনে

যে ব্যক্তিটি রয়েছে সে কে! ডাক্তার সেন নিশ্চয়ই নয়। তার স্ত্রীর যা দাপট তাতে মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলবার সাহসও তার নেই। ডাক্তার গোলাম হোসেন কি? কণা আসবার পর তিন-চারদিন মাত্র ডাক্তার হোসেনকে দেখেছে। তারপরই সে ছুটি নিয়ে চলে গেছে দেশে। তার আচার-আচরণ সম্পর্কে কণার কোনই ধারণা নেই। আবার off day-তে দীপালি শহরে গেছে। সেখানে কোন প্রেমাস্পদ নেই তো। উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি তো। কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে সবটা। কণা দোদুল্যমান মন নিয়ে বাসায় এসে কাপড়-জামা বদলে সদরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

ছয়

চাকরির জীবন যতই একঘেয়ে হোক তবুও কণা শহরে আসেনি একবারও মফঃস্বলের এই শহরের ওপর অনুরাগও তার ছিল না। যদি কোন জিনিষের প্রয়োজন হয়েছে তা হলে ড্রাইভারের হাতে টাকা দিয়ে সদর থেকে তা আনিয়ে নিয়েছে। আজও সে আগ্রহ নিয়ে আসেনি শহরে। অক্সিজেন আর ওষুধপত্র নিয়ে যত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারে ততই তার পক্ষে সুখকর।

রাস্তায় ড্রাইভার রঙ্গনাথকে জিজ্ঞেস করেছিল, রঙ্গদা, তোমার গাড়িতে যথেষ্ট তেল আছে তো?

রঙ্গনাথ হেসে বলল, না থাকলে কিনে নেব। কেন? কোথাও যাবে নাকি দিদিমণি।

ভাবছিলাম ঝর্ণার কাছে যাব। আমার সাথে পড়ত। এখন সে আছে আদমপুর হাসপাতালে।

আদমপুর অনেকদূর দিদিমণি। ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

তা হলে দরকার নেই। অক্সিজেনটা তাড়াতাড়ি না নিয়ে গেলে বাচ্চাটা হয়ত বাঁচবে না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চল কাজলদীঘি।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল কাজলদীঘিতে কিন্তু শিশুকে বাঁচানো যায় নি। কণা নিজেই গ্যাসের পাইপ ধরে বসেছিল, সে আশা ছাড়েনি, আশা ছেড়ে হতাশ হবার মত মেয়ে সে নয়। যার জীবনীশক্তি নেই

তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই সফল হল না। রাত এগারটা নাগাদ শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল। কণা অসারের মত বসে রইল শিশুর পাশে। দরদর্‌ করে চোখের জল নেমে শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে দিল। সে দিকে তার কোন হুঁস-ই ছিল না। এলিস এসে ডেকে নিয়ে না গেলে ওভাবেই হয়ত রাত কেটে যেত।

সে-রাতে না খেয়েই শুয়ে পড়ল। এলিস ডেকেও তাকে তুলতে পারল না।

পরদিন দুপুরে মায়ের চিঠি পেল কণা। টাকা প্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে লিখেছে, এবার তোর বিয়ে দিতে চাই খুকি। যদি অমত না করিস তা হলে আলিপুরদুয়ারের সেই ছেলেটার সাথে কথা পাকা করতে পারি। অবশ্য আমার কোন জোর-জবরদস্তি নেই। তুই যা ভাল বুঝবি তাই করব।

কণা দুদিন ধরে ভাবল। অবশেষে মমতাময়ীকে লিখল: বিয়ে আমি করব, কিন্তু এখন নয়। পরিচয় দেবার মত যোগ্যতা যদি কোন-দিন অর্জন করতে পারি তবেই, নইলে নয়। আলিপুরদুয়ারের সেই ভদ্রসন্তানকে আর আশা দিয়ে রেখ না। রুচিবোধে আটকাচ্ছে।

ডাকে চিঠি পাঠিয়ে কণা গেল দীপালির কোয়ার্টারে। দীপালি মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে, সুচরিতা বসে আছে তার পাশে। সুচরিতা বলল, দীপা ছুটি নিয়েছে।

কণা মৃদুস্বরে বলল, আর দুমাস পরে ছুটি নিলেই ভাল হত সুচিদি।

কেন রে?

ম্যাটারনিটি লিভ পেত।

সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটি যেত।

কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকল এলিস। এসেই বলল, ডাক্তার গোলাম হোসেন ছুটি নিয়ে পাকিস্তানে পালিয়েছে।

দীপালির মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিল, কিছুক্ষণ ছাদের দিকে চেয়ে থেকে বলল, জানতাম।

কেন?

অপরাধীর আর কোন পথ খোলা ছিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দীপালি চুপ করে গেল।

কৃষ্ণ যবনিকা উঠে গেল কণার চোখের সম্মুখ থেকে। আজ পরিষ্কার হল এই নাটকের কাহিনী। নিজের মনেই বলল, দীপাদি, তোমার রুচির প্রশংসা করতে পারছি না।

দীপালি চোখ বুঁজে রইল।

কলকাতায় যাবে দীপাদি ?

কেন ? সন্তান বলি দিতে। মৃদুস্বরে বলল দীপালি।

দীপালির নিষ্ঠুর জবাবে মনে মনে আহত হল কণা। সেও মৃদুস্বরে বলল, সন্তানের অপরাধ।

পিতৃপরিচয়হীনতা। কুমারী কন্যার সন্তানের গৌরব কোথায় ? তার চেয়ে ওর মরণ ভাল।

কণা তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল, কে বলে তুমি কুমারী। কৌমার্য তোমার অনেক আগেই তো শেষ হয়েছে। মনের ও দেহের কোথাও তুমি কুমারীর ছায়াটিও রাখনি। তোমরা ভীরু, তাই সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারনি যে তোমরা স্বামী-স্ত্রী। এই ভীরুতার শাস্তি কেন দেবে সন্তানকে ! তুমি যে ব্যভিচার করবে তার প্রতিক্রিয়া সহ্য করবে অজ্ঞান নিরপরাধ শিশু !

কি বলিস কণা, সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে কেন ? আইন স্বীকার করবে কেন ?

কণা হাসল।

হাসছিস ?

না হেসে পারলাম না দীপাদি। তুমি যাকে শয্যার সঙ্গী করলে তাকে স্বামী বলে স্বীকাব করতে পারলে না। এই তো তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি দেহপণ্য করে বাঁচতে চাওনি নিশ্চয়ই ! তুমিও চেয়েছ সুন্দর জীবন। যদি নারী ও পুরুষ পরস্পরের হৃদ্যতা নিয়ে বাস করতে পারে। তার যে পুরস্কার সন্তান, সে সন্তানের পিতামাতার পরিচয় খোঁজবার প্রয়োজন থাকে কি। সমাজ ও আইন একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষকে সংসার সাজিয়ে বসবাসের অধিকার দিয়েছে। পুরুষ ও নারী সঙ্গী বদল করতে পারে। নতুন সংসার সাজাতে পারে তা বলে এককালীন দুইটি স্ত্রী অথবা দুইটি স্বামী নিয়ে বাস করতে পারে না। তাই যদি হয়, তুমি কেন পাবে না সন্তানের পিতৃপরিচয়। সমাজ কি দিয়েছে ?

না দিয়ে কেড়ে নেবার অধিকার সমাজের নেই। আইন তোমাকে রক্ষা করেনি। আইনকে ফাঁকি দিতে সন্তান নিধন কি সভ্য চিন্তা! তুমি তোমার অক্ষমতাকে গোপন করতে, তোমার ভীরুতাকে মুখোস পড়াতে সন্তানের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছ। সন্তানতো পিতার অস্তিত্ববিহীন হতে পারে না। ওর বাবা একজন আছে। সে যদি পিতৃপরিচয় গোপন করে করুক সে কাপুরুষ ব্যাভিচারি সমাজের কলঙ্ক। তুমি কেন মায়ের পরিচয় কলঙ্কিত করবে!

দীপালি উত্তর খুঁজে পেল না।

সুচরিতা এতক্ষণ কণার যুক্তিগুলো মন দিয়ে শুনছিল। এবার সে মুখ খুলল। বলল, তোমার হলে কি হত?

প্রথমেই বোঝাপড়া না করে বোকার মত নরকের প্রহরী হবার মত মেয়ে কণা নয়। আইন ও সমাজের রজ্জু যে বন্ধন দেবে তার চেয়ে গুরুতর বন্ধন যদি দিতে না পারি হৃদয় দিয়ে তা হলে কাউকে আমার সঙ্গী করে নিতে পারব না কোন দিনই। আমাদের হৃদয় ধর্মের দান যে সন্তান সে সন্তানকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরতাম নিশ্চয়ই। আমি যাকে স্বামী বলে বিশ্বাস করি, যে আমাকে স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার দেবে তার দান মাথায় পেতে নেব। নিজেকে উজাড় করে নিবেদন করব তার কাছে।

সুচরিতা বাধা দিয়ে বলল, তুই নাটক লেখ কণা। তোর নাটক চলবে ভাল। তোর যুক্তি কঠিন ও কোমল, এটা অস্বীকার করতে পারি না। তবে এসব নাটক নভেলেই শোভা পায়। তুই নাটক লেখ।

তা মন্দ নয়। বলে কণা হাসল। তোমাদের বাস্তব নাটক শেষ হলে আমি কল্পনার নাটক লিখব। অভিনয়ে সবাইকে পার্ট নিতে হবে কিন্তু।

সুচরিতা গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। কণার মিষ্টি কথার তলায় যে বিষের সুঁচ তা তার বুকে শেলের মত বিঁধল। কণাও ফিরে যাচ্ছিল। ডাকল দীপালি।

কি করব বল না ভাই! কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

কণা হেসে বলল, মা হবার আকাঙ্ক্ষায় যখন নিজেকে আহুতি দিয়েছ তখন মাতৃত্বের গৌরব থেকে কেন বঞ্চিত হতে চাও।

নারীত্ব যে ধ্বংস হল।

তোমার ভুলে। তারজন্য তোমার কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

এরপর চাকরি থাকবে কি!

সেটা সরকারের দয়া। তবে শিশু নিধন করলে চাকরি যাবে।

তাও ভেবেছি। কি করব! বল না।

দীপালির ব্যাকুলতায় কণা বেতালা হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি আমাকে সাতটা দিন সময় দাও। আমি সাতদিন পরে তোমার কথার জবাব দেব।

সাতদিন! টেনে টেনে বলল দীপালি।

হ্যাঁ! একটু সামলে চল। আমি মাকে লিখেছি। তার কাছ থেকে নিশ্চয় সু-পরামর্শ পাব।

সাতদিন পরে কণা চুপি চুপি এসে বলল, তুমি ক'মাসের ছুটি নাও দীপাদি। মা তোমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। সেখানে নিশ্চিন্ত মনে বাস কর। সন্তান প্রসবের পর আমার মায়ের কাছে তাকে রেখে আবার কাজে যোগ দিও। কেমন!

তোমার মা এ দায়িত্ব নেবেন কি?

কণা হাসল।

হাসছ কেন?

আমার মাকে আমি চিনি। হাজার কলঙ্ক তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি, পারবেও না। তার সব দোষ ঢেকে গেছে তার সন্তানপ্রীতিতে। তার কাছে শিখে এস কেমন করে সন্তানকে ভালবাসতে হয়! সন্তানের জন্য কত বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

দীপালি মুখার্জি ছুটি নিয়ে চলে গেল মমতাময়ীর কাছে।

কণা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এলিসকে বলেছিল সব কথা। এলিস ক্ষুন্নভাবে বলল, এরা যখন বৃত্তি ঠিক করে তখন ভেবে দেখে না সে বৃত্তির পেছনে রয়েছে কত প্রলোভন। এমন ভুল করা উচিত হয়নি।

তবুও মানুষ ভুল করে, কেননা ভুল করাটাই মানুষের স্বভাব। আর ভুল করে বলেই মানুষ দুঃখ পায়। নির্ভুল মানুষের কোন দুঃখ থাকে কি! ভুলো মানুষ দুঃখ ভুলতে চায় বলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি।

তা বটে। তবুও সচরাচর যা ঘটে তা থেকে সাবধান থাকা উচিত।

কণা হেসে বলল, তুমি বোধহয় ডাক্তার মিসেস্ ব্যানার্জির কাছে পড়নি। তার কাছে পড়লে তুমি এ কথা বলতে না। তিনি বারবার বলেছেন, মানুষের যৌনবোধ সব সময়ই উচিত-অনুচিত প্রশ্নের অনেক অনেক ঊর্ধে। তুমি বিবাহিতা, এ জ্ঞান তোমার থাকা উচিত। ভুল কোথায় জান? বিচারের ভুল। যে আসে, সে ভালবাসে অথবা ভালবাসার অভিনয় করে এটা বিচার করতে আমরা ভুল করি। দীপালি সেই ভুলই করেছে।

তোমার মা তাকে গ্রহণ করবেন?

বর্জন করবেন না, এইটুকু বলতে পারি। আর্থিক সামর্থ্য থাকলে পরিচর্যার কোন অসুবিধাও হবে না।

এলিস অবাক হয়ে কণার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কণা জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ?

কিছু নয়। ঘোষ আসছে।

তা হলে তো তোমার সুখ।

খুব নয়। মোটামুটি।

কেন?

সে কথা শুনে লাভ নেই। বলেই গম্ভীর মুখে এলিস উঠে গেল।

বিকেলবেলায় কাজলদীঘির ঘাটে একাই বসেছিল কণা। পেছন থেকে সুচরিতা ডাকল, জিজ্ঞেস করল, কি করছিস কণি?

দীঘির কালো জল দেখছি সুচিদি। এত কালো জলেও মনের কালিমা ঢাকা পড়ে কিনা তাই ভাবছি। আচ্ছা সুচিদি, তোমার মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না।

নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু ছুটি যে পাচ্ছি না। পেলেও তো চিরকাল মায়ের কোলে থাকতে পাব না।

তা বটে। কণা মাটির ঢিল তুলে ছুঁড়ে মারল দীঘির জলে।

একটা কথা বলতে এলাম।

কণা হেসে বলল, অনেক কথাই তো বলেছ। আবার কি বলবে?

তোর কাছে আজ চুপি চুপি মাপ চাইতে এসেছি। তোর সাথে মন্দ

ব্যবহার করেছি, সেজন্য আমি অনুতপ্ত। তোর মত মনটা পেলে আমি ধন্য হতাম।

কি বলছ সুচিদি। আমি তো মনে করিনি তুমি মন্দ ব্যবহার করেছ। বরং মনে করেছি, আমার যা প্রাপ্য তাই আমাকে দিয়েছ! এতে মাপ চাইতে হবে কেন!

তোর মন দিয়ে বিচার আমরা করি না ভাই। আমার কথা আমি বলেছি।

কণা উঠে দাঁড়িয়ে সুচরিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না সুচিদি।

সুচরিতা কোন উত্তর দিতে না পেরে কণার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কোয়ার্টারের দিকে।

কদিন ধরেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে মেঘের দাপাদাপি। কাজলদীঘির কালো জল আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। আগে যেখানে দাঁড়িয়ে সবাই স্নান করত সেখানে মানুষ ডোবা জল। পাড়ের এঁটোলো মাটিতে পা আটকে যায়। দীঘির কিনারায় যে সব ঝোপঝাপ শুকিয়ে গিয়েছিল চৈত্র-বোশেখে সেগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসে ঢেকে গেছে সামনের মাঠটা। জলে-কাদায় হাসপাতালের মাঠটা হয়ে গেছে ছোটখাট হ্রদের মত। কাদা ভেঙ্গে কোনরকমে নাইট সেরে কণা ফিরে এল আস্তানায়।

কণাকে ফিরে আসতে দেখে এলিস চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কোন সিরিয়াস কেস আছে কি?

না। একটা লেবার কেস এসেছে। হয়ত তোমার ডাক পড়বে এখুনি।

এলিস ছাতা মাথায় দিয়ে কণার বারান্দায় এসে লজ্জিতভাবে বলল, আজ দেরি হয়ে গেছে ভাই। সারা রাত বৃষ্টি, ঘুমটাও কেমন পেয়ে বসেছিল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি তোমার ঘোষদা রাঁধতে বসেছে। আমি যেমন উঠেছি অমনি ছুটে এসে বলল, খবরদার বিছানা থেকে উঠ না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তোমার ঘোষদা বলল, এতদিন একা একা সংসার সামলে চলেছ। একটা দিন আমি সামলাব।

এলিস হাসল।

কণা হেসে বলল, কপাল করতে হয় ঘোষদি।

তা বটে। আমার শত্রুর যেন এমন কপাল না হয়।

বটে! আমি বলছি ঘোষদাকে। দেখবে কেমন ঝগড়া লাগিয়ে দি।

ঝগড়া আর লাগিয়ে দিতে হবে না! লেগেই আছে সারাক্ষণ। তোমাকে আর নারদ সাজতে হবে না। আমি যাচ্ছি মর্নিং করতে। আমি এলে তুমি খাবে—আমার ওখানে।

বলতে বলতে এলিস নেমে গেল হাসপাতালের মাঠে।

কাপড়-জামা বদলে চা করতে বসেছে কণা। ভিজতে ভিজতে এল সুচরিতা। বিনা ভূমিকায় বলল, দীপার বদলি এসেছে একজন। আহা, রূপের যেন ডিপো। বালিগঞ্জের কয়লার সাইডিং-এ এ রূপ মানাতো। তার ওপর বগলকাটা ব্লাউজ। পেটখোলা মাড়োয়ারী প্যাটার্নের অজন্তা চিত্র। ওয়ার্ডের রুগীরা আবার ভিরমি না খায়।

কণা উদাসভাবে বলল, কি নাম?

নামে কমতি নয়। বেলা দেব। দেব না দৈত্য! হায়রে রূপ! এ রূপে দৈত্যই মানায়।

কণার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে সুচরিতা দেওয়াল পঞ্জীর দিকে নজর দিয়ে বলল, আজ সাত তারিখ। দীপা গেছে বিয়াল্লিশ দিন। কোন চিঠিও দেয়নি। তুই পেয়েছিস কণি?

আমিও পাইনি। মায়ের চিঠিতে জেনেছি দীপাদি ভালই আছে। তবে ঘর থেকে বের হয় না, দম ধরে জানলার পাশে বসে থাকে।

ওটা ওর প্রাপ্য ছিল। কতদিন নিষেধ করেছি, শোনেনি। মানুষের রূপটাই দেখলি, ভেতরটা দেখলি না। পোড়া কপাল আর কাকে বলে।

সুচরিতা নিজের মনে গজরাতে গজরাতে বেরিয়ে গেল।

কণা দীপালির কথা অনেক ভেবেছে। ভেবে কোন কুল-কিনারা পায়নি। অনেক দিন ভেবেছে, দীপালির মত অবস্থায় সত্যিই যদি তাকে পড়তে হত তা হলে সে-ই বা কি করত! কি করত সে জানে না। তবে দীপালির ভ্রম তাকে শিক্ষা সমাপনের সুযোগ দিয়েছে। এইটুকুই তার পরম লাভ।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ এখনও কালো মেঘে ঢাকা।

কণা জানলা খুলে অশান্ত আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। মনটা তার ছুটে চলে গেছে কত দূরে। কে জানে!

সাত

ডাক্তার হোসেনের জায়গায় এসেছে ডাক্তার পাল। সবে পাশ করে বেরিয়েছে। ফিটফাট পোশাক। খুব কম কথা বলে। অবসর সময়ে একা একা ঘুরে বেড়ায় গ্রামের পথ ধরে। রুগীদের যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে। গরীব রুগীদের গাঁটের পয়সা দিয়ে চিকিৎসায় সাহায্য করে। ডাক্তার পালের সুখ্যাতি ছড়িয়েছে এর মধ্যেই। কণির ভালই লাগে লোকটাকে।

ডাক্তার পাল জিজ্ঞেস করল, দু' নম্বর একসট্রা বেডের রুগীর কি অবস্থা মিস্ মজুমদার।

কণা জ্বরের চার্ট দেখতে দেখতে বলল, শেষ রাত থেকে জ্বরের গতি নিম্নমুখি।

জ্ঞান হয়েছে কি?

না।

ওকে সদরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

কণা ইতস্তত করে বলল, আর কটা দিন দেখলে কেমন হয়!

মিস্ মজুমদার, ওর দায়িত্ব আমাদের কাঁধে রাখা বোধহয় ঠিক হবে না। বরং ওপরওলাদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের ডেথ্ লিস্টটা খালি রাখি। এখানে যন্ত্রপাতি তেমন নেই, ওষুধেরও অভাব রয়েছে।

আমার মনে হচ্ছে।

কি মনে হচ্ছে।

বোধহয় আরাম হবে।

হবে। তবে সারা জীবনের মত অক্ষম হয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। একটা ভিখিরি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? বোধহয় দিয়ে মানুষ চলতে পারে কি। বিশেষত যেখানে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।

কণা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি যা বলছেন তা সত্য। তবুও

'বোধহয়' নিয়েই মানুষ বাঁচে, কেননা জীবনে কোন জিনিষই নিশ্চিত নয়, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। আর সব কিছুই বোধহয় দিয়েই গড়া।

ডাক্তার পাল কণা সম্পর্ক আগ্রহশীল কিন্তু তার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটেই সজাগ নয়। কণার তীক্ষ্ম যুক্তিতে থ' হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কণার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনি কি চান?

আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস প্রমাণ করতে চাই। দায়িত্ব লাঘবের প্রলোভনে নিজেদের ক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাই না। আমরা চান্স নেব। ওকে বাঁচাতে চাই।

ডাক্তার পাল আশ্চর্য হয়ে গেল নার্সের কথা শুনে। হাতের কলমের গোড়াটা দাঁতে চেপে বলল, Right you are—আপনি কি আন্তরিকতার সাথে সব চেষ্টা করতে পারবেন!

নিশ্চয়ই! আমি কুড়িয়ে এনেছি ওকে। ভিখিরি হোক অথবা রাজার ছেলে হোক, আমি আমার সব চেষ্টা দিয়ে সেবা করব। আর আপনি আপনার সব চেষ্টা দিয়ে চিকিৎসা করবেন। আমি সকালবেলায় কুড়িয়ে পেলাম ওকে শিমুলতলায়। কুড়িয়ে পাওয়া মানুষটাকে বিদায় এত সহজে দিতে পারব না ডাক্তার পাল।

আপনি এনেছিলেন?

সকালবেলায় মাঠে মাঠে বেড়াতে যাই মাঝে মাঝে। কালকে গিয়ে দেখি লোকটা শিমুলতলায় শুয়ে আছে। কেমন মায়া হল। কাছে গিয়ে ডাকলাম। কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি রঙ্গদাকে ডেকে হাসপাতালে আনবার ব্যবস্থা করলাম। ডাক্তার সেনকে বলে একটা সিট পেলাম। বাঁচবে কি না জানি না। তবুও কাল যাকে মমতা দিয়ে তুলে এনেছি, আজ তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ করতে পারছি না। যেদিন কাজ থেকে অবসর নেব সেদিন নিজের কাছে কৈফিয়ত খুঁজে পাব না। অন্তত একজন মানুষের প্রতি আমার হৃদয়ের মমতা উজাড় করে দিতে পেরেছিলাম—একথা ভেবে সান্ত্বনা পাব। আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না নিশ্চয়ই।

বেশ। চেষ্টা করুন। বলেই ডাক্তার পাল বেরিয়ে গেল।

কণা ফিরে এসে বসল রুগীর পাশে। দু' নম্বর এক্সট্রা বেড তার যেন

জমিদারি। সেখানে সে বসে রইল সারারাত। রুগী যখন বেহুঁসভাবে বলতে থাকে নানা কথা, তখন সে কান পেতে রাখে। মাঝে মাঝে অন্য রুগীদের কাছে এগিয়ে গেলেও তার দরদভরা দৃষ্টি থাকে দু' নম্বর এক্সট্রা বেডে। ভাল করে জেঁকে বসল ডিউটি শেষ করে। নতুন নার্স বেলা দেব এসেছে ডিউটিতে। কণাকে বসে থাকতে দেখে বলল, আপনি এখনও বসে আছেন ?

কণা হেসে বলল, স্পেশ্যাল ডিউটি করছি।

মুখ ভার করে বেলা দেব বলল, বেশ। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি ?

সে কথা এখনও ভাবিনি।

বেশ। বেলা দেব রাউন্ড দিতে গেল।

একদিন-দুদিন করতে করতে চারটে দিন কেটে গেল। রুগীর অবস্থার উন্নতি অতি শ্লথ গতিতে দেখা যাচ্ছিল। পঞ্চম দিনের শেষ রাতে চোখ মেলে তাকাল রুগী। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে আবার চোখ বুঁজল।

কণা ছিল মহিলা বিভাগে। মাঝরাতে লেবার কেস এসেছে। তাকে নিয়েই সকাল অবধি কাটাতে হয়েছে তাকে। শেষরাতে একবার এসে দেখে গেছে দু' নম্বর এক্সট্রা বেড। কোনই পরিবর্তন তার চোখে পড়েনি। লেবার থিয়েটার থেকে বের হবার সময় পুরুষ বিভাগে উঁকি মেরে দেখল। দেখল দু' নম্বর এক্সট্রা বেডের রুগী পাশ ফিরে শুয়েছে। ভয় ও ভরসার সংঘর্ষ নিয়ে ধীর পদক্ষেপে কণা এগিয়ে এল। উদাস দৃষ্টি নিয়ে রুগী চেয়ে রয়েছে জানলার দিকে। চোখ দিয়ে ফুটে বের হচ্ছে কত জিজ্ঞাসা। নার্সকে সামনে দেখে হাঁ করে মুখ দেখিয়ে দিল। কণা তাড়াতাড়ি মেজার গ্লাসে করে জল এনে দিল রুগীর মুখে। কাঁচাপাকা দাড়িভরা মুখখানার ওপর রুগীর চোখ দুটো যেন ঠিকরে পড়ছিল। তাতে যেন লেখা রয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার সামর্থ্য ছিল না কণার। সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইল সে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

সুচরিতা আসবে এখুনি। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়।

কণার অস্থির চেহারা দেখে সুচরিতা জিজ্ঞেস করল, তুই এখনও যাসনি কণি ?

তোমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। শোন সুচিদি, ঐ যে দু' নম্বর এক্সট্রা বেডের রুগী, ওর জ্ঞান হয়েছে।

সুচরিতা লক্ষ্য করল একটা পরিতৃপ্তির পরশ কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে কণার মুখের পেশীতে। সে ঠাট্টার সুরে বলল, আধা-বুড়োটা তাহলে মরেনি।

তাইতো দেখছি। হাসল কণা।

তোর সেবার গুণে। আমরা পারতাম না। রাস্তা থেকে ভিখিরি কুড়িয়ে এনে যা দেখালি, বাপরে! আর দেখলাম ডাক্তার পালকে। তোরা দুজনে যেন ক্ষেপে উঠেছিলি। তোরাই জিতলি। যম রাজার পরাজয়। এবার তোর শান্তি!

তা বুঝলাম। তুমি একটু নজর রেখ! আমি তিনটের সময় এসে দেখে যাব।

তিনটের আগেই নন্দ নাপিতকে সঙ্গে করে কণা এল ওয়ার্ডে। তার উপদেশ মত অতি সতর্কতার সাথে দাড়িগোঁফ কামিয়ে দিল রুগীর। সুচরিতাকে জিজ্ঞেস করল, রুগী কথাবার্তা বলেছে কি? দাড়িগোঁফের তলা থেকে যে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা দেখা গেছে। সেই মুখ থেকে কোন কথা না বের হওয়া অবধি শান্তি নেই। তবুও জ্ঞান হয়েছে, আশার প্রদীপ উজ্জ্বল হয়েছে। নিজের সাফল্যে আত্মহারা হয়ে উঠল কণিকা মজুমদার।

ধীরে ধীরে রুগীর বেডে বসল, জিজ্ঞেস করল। কি নাম তোমার?

রুগী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েছিল তার দিকে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, অ—ম— ।

কণা সঙ্গে সঙ্গে বলল, অমল।

রুগী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রুগীর চার্টে অজ্ঞাতনামা বলে পরিচয় ছিল। সেটা কেটে কণা নাম লিখল, অমল।

পরদিন রুগী ধীরে ধীরে কথা বলতে আরম্ভ করল। নাম বলল, অমলেন্দু লাহিড়ি। ঠিকানা বলল, বিশ্ব ধরেই আমার ঠিকানা। আত্মীয়স্বজনের নাম নেই।

অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, আমি এখানে কেন? কে আনল এখানে?

কণা বলল, তুমি রুগী তাই স্থান পেয়েছ হাসপাতালে। আর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম আমি।

না আনলেও হত।

কেন ?

আমি মরতে এসেছিলাম। মরণকে রোধ করতে আসিনি।

কণা গম্ভীরভাবে বলল, মরণকে কেউ বোধ করতে পারে না। আমরা বিলম্বিত করেছি। এটাই আমাদের ধর্ম।

তা বটে। কি লাভ ?

লাভের হিসাব করে সবাই কি কাজ করে। তুমি কি লাভের হিসাব করে মরতে এসেছিলে।

অমলেন্দু বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কণা ফিরে গেল।

মৃত্যুকে যারা ত্বরান্বিত করতে চায় তাদের অতীত থাকে আক্ষেপভরা, মনটা পূর্ণ থাকে হতাশায়। তারা স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, হঠকারি। কত কি জমে রয়েছে অমলেন্দুর পেছনে, কে জানে। তবুও মরণ বিলম্বিত হয়েছে। আক্ষেপভরা জীবনে আরও কত দীর্ঘশ্বাস নেমে আসবে।

বিকেলে ডিউটি ছিল এলিসের।

অমলেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বলল: তোমার কপাল !

কেন ?

কণির সেবা না পেলে কি হত কে জানে। হাঁ, সেবা করতে দেখলাম ওকে। ওর মনে কি ঢুকল কে জানে। রাতদিন তোমার সেবায় মেতে উঠল। ডাক্তার পালও ওর কথায় উঠতে বসতে লাগল। আমরা ঠাট্টা করতাম। কণি বলল, লোকটাকে কেন যেন মেঠো ভিখিরি মনে করতে পারছি না। তাই নেড়ে-চেড়ে দেখছি। যদি বেঁচে ওঠে। শোনাব ওর কথা।

অমলেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, কপাল।

তাই তো বলছি। কপাল না হলে এমন হয়। আমাদের সুচিদি বলেছিল, একটা আধা-বুড়ো নিয়ে যে পাগল হয়ে উঠলি। ছোঁড়া হলে কি করতিস !

কণি তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিল, বুড়ো। তা বটে। বিশ বছরেও

বুড়ো হয় অনেকে। আবার ষাটেও তরুণ থাকে অনেকে! বুড়ো কেউ হয় না। বুড়ো হয় মন। আর বুড়ো বলেই তার সেবা করব না নাকি। রুগীর বয়স ধুয়ে জল খেতে হবে কি! রুগী রুগী, বাস্!

অমলেন্দুর চোখের কোণ বেয়ে অসাড়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বালিশে।

এলিস তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, কষ্ট হচ্ছে তোমার?

মোটেই না। বেশ আছি। আবার বুঝি নতুন জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। আপনাদের সেই নার্সকে তো আজ দেখছি না।

কাজ ফুরিয়েছে, আর সে আসবে না বোধহয়। বড়ই খেয়ালি।

অমলেন্দু কোন উত্তর না দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইল।

এলিস ফিরে এসে কণাকে বলল, দুই নম্বরের এক্সট্রা বেড খুঁজছিল তোমাকে।

কণা কোন উত্তর না দিলেও লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল তার মুখখানা।

সকালবেলায় কণা ডিউটিতে এসেই অমলেন্দুর বেডের কাছে দাঁড়াল। অমলেন্দু তখনও ঘুমোচ্ছিল। ঘুম না ভাঙ্গিয়ে চলে গেল মেয়েদের ওয়ার্ডে। পরশুদিন বিকেলে মেয়ে ওয়ার্ডে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। কোন এক রহিমা বিবির স্বামী এসেছিল। সে দাবী জানাল রহিমার ছেলে তারই ছেলে। আবার রহিমার আগের স্বামী এসে বলল, এ ছেলে তার। তালাক দেবার সময় ছেলে ছিল রহিমার গর্ভে। দিন হিসাব করলে তাই হয়, কিন্তু গর্ভের এক মাসের সন্তানের হিসাব করা সহজ নয়। আইনত এই সন্তানকে রহিমার বর্তমান স্বামীর সন্তান বলেই স্বীকার করতে হবে। অথচ দিন গণনা করে আগের স্বামী এসেছে দাবী নিয়ে। ওয়ার্ডের হাঙ্গামা বাইরের লনে দাঙ্গার অবস্থা সৃষ্টি করতেই হাসপাতাল শুদ্ধ সবাই ছুটে এসেছিল দাঙ্গা থামাতে। সেজন্য ডাক্তার সেনের কঠোর আদেশ, মেয়ে ওয়ার্ডে বিনা পরিচয় পত্রে প্রবেশ নিষেধ। নার্সদের প্রথম কাজ হল, মেয়েদের ওয়ার্ড তত্ত্বাবধান করা। পুলিশ পাহারাও বসেছে। তবুও। কণা পুরুষ বিভাগ থেকে তাই ছুটে গেল মেয়ে বিভাগে।

মেয়ে বিভাগ সেদিন শান্ত। রহিমা বিবি আজই বিকেলে চলে

যাবে। হাঙ্গামা যাতে না হয় তার জন্য পুলিশ মোতায়েন। স্টাফরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত।

মেয়ে বিভাগ থেকে আটটার সময় কণা ফিরে এল পুরুষ বিভাগে। অমলেন্দু আজ উঠে বসে বালিশ হেলান দিয়ে রয়েছে, দূর থেকে তাকে বসে থাকতে দেখে কণা ছুটে এসে বলল' ওকি করেছ! তোমার নড়াচড়া একদম নিষেধ।

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল অমলেন্দুর মুখে। আমি বেশ সুস্থ হয়েছি তো।

তুমি বুঝি ডাক্তার! আমরা যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে।

অমলেন্দু আবার হাসল, শাসনের বিনিময়ে মিষ্টিহাসি দিয়ে বলল, দেহটা তো আমার। আমি নিজের দেহের অবস্থা বুঝি।

কণা বিরক্তির সাথে বলল, অতই যদি বুঝতে তা হলে শিমুলতলায় মুখ থুবরে থাকতে কি। আর আমাকেই বা এত হাঙ্গামা পোয়াতে হত কি! নাও, শুয়ে পড়।

অভিভাবকের শাসানি ফুটে উঠল কণার কণ্ঠস্বরে। অমলেন্দু সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে কণাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল। কেমন একটা দুর্বল চিন্তা তাকে পেয়ে বসল, সে ধীরে ধীরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল! কণা তীক্ষ্নস্বরে বলল, আমি যতদিন না বলছি ততদিন মোটেই উঠতে পাবে না।

কণা ফিরে যাচ্ছিল। অমলেন্দু ডাকল, শুনুন।

ফিরে দাঁড়িয়ে কণা বলল, কেন?

আপনি-ই মিস্ মজুমদার?

জানবার প্রয়োজন আছে কি?

না, তেমন কিছু নয়। তবে শুনেছি মিস্ মজুমদারের কৃপায় আমি বেঁচে উঠেছি।

কণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভগবানের কৃপায়।

ঐ ব্যক্তিটির আমি কৃপা কখনও চাইনি। যার কৃপার সাক্ষাত পেয়েছি তার পরিচয় জানতে চেয়েছি।

থমকে দাঁড়াল কণা।

অমলেন্দু উত্তর পাবার আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঝটিতে মুখ ফিরিয়ে কণা বলল, মনে কর আমিই মিস্ মজুমদার।

আমিও তাই ভেবেছি। নইলে অমন করে শাসন করা কারও সাজতো না।

শাসন!

সেবা যে করে সেই তো শাসনের অধিকারী। অন্যায় কিছু নয়। অবাধ্য শিশুকে মা শাসন করেন, কেন না ভালবাসেন। বিপথগামী স্বামীকে স্ত্রী গঞ্জনা দেয় কেন না সেখানে তার ভালবাসা আঘাত পায়।

উত্তর দেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করে কণা লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

ডিউটি শেষে আবাব এল কণা। তাকে দেখেই অমলেন্দু বলল, অশেষ ধন্যবাদ!

অকারণে! কণা হাসল।

আপনার পক্ষে যা কারণ নয়, আমার পক্ষে সেটাই মহা-কারণ।

বাড়ি ফিবে গিয়ে এসব চিন্তা কর, এখন তুমি রুগী। চুপ করে শুয়ে বিশ্রাম করাই তোমার কাজ।

চুপ করেই ছিলাম, রুগী সেজেই ছিলাম। অনেক বছর রুগী সেজে থেকে আজই প্রথম মনে হচ্ছে আমার কোন রোগ নেই। আর কোনদিন হবেও না। নেহাত বাংলাদেশ, তাই পথে-বিপথে বাংলার মেয়েদের স্নেহের পরশ এমনি অযাচিতভাবে পাওয়া যায়। এই সঞ্চয়টুকু হবে বলেই বোধহয় ঐ শিমুলতলায় মুখ থুবরে পড়েছিলাম, আর আপনার স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছিলাম।

কণার চোখের ওপর ম্লান ছায়া নেমে এল। মৃদুস্বরে বলল, স্নেহ-দৃষ্টি-ই সবকিছু নয়।

তাও ঠিক। বিনিময় প্রার্থনা যারা করে না তাদের স্নেহের কোন ব্যাখ্যাও হয় না।

কেউতো বিনিময় প্রত্যাশীও হতে পারে।

অমলেন্দু হাসল। সেই ক্ষীণ হাসির সাথে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, দেখার সামর্থ্যও থাকা চাই তো।

ওটা হল আপেক্ষিক। এ আলোচনা আজ থাক। বলেই কণা কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল।

বিকেলবেলায় ডাক্তার পালের স্লিপ পেয়ে কণা এল হাসপাতালে। সে আসতেই ডাক্তার পাল বলল, আপনার রুগী ছুটি চায়।

কণার মুখের পেশীগুলো হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হাসপাতালের আমরা সবাই কল্পতরু। যে যা চায় তাকে তা দিয়েই আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করি। যে ছুটি চায় তাকে ছুটি দেয়াও একটা কর্তব্য। ছুটি চায় ছুটি দিন।

এটা রাগের কথা। আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে লোকটাকে। ভেবেছিলাম ভিখিরি, কিন্তু মিস্ মজুমদার, ওর সাথে কথা বলে আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে।

কি রকম ?

নিজের নামটা বলেছিল ঠিকই কিন্তু ঠিকানা দেয়নি, স্বজনের নাম বলেনি। অথচ কথাবার্তায় উচ্চশিক্ষার মান বজায় রেখে বেশ সৌজন্য রক্ষা করে এসেছে এতদিন। একদিন বলল, ডাক্তারবাবু, হয়ে গেলেই শেষ হয়। কথাটা ওর নিজের নয়। সেক্সপীয়রের কথা। পড়াশোনা না করলে এমন মন্তব্য সম্ভব কি ! আপনিই বলুন। আমি কদিন ধরে ওরই কথা ভেবেছি। কোন কুলকিনারা করতে পারিনি।

আমারও মনে হয়েছে কি যেন রহস্য জড়িয়ে আছে ওর জীবনে।

মরুক গে ! আমাদের রুগী। নিরোগ হয়েছে। অবধারিত মৃত্যুকে রোধ করেছি, এই আমাদের কৃতিত্ব এবং সান্ত্বনা। ছুটি দিয়ে দি, কি বলেন !

মাটির দিকে মুখ রেখে কণা বলল, আর দুটো দিন আটকে রাখুন। নইলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আপনার কেমন মমতা জন্মেছে। বেশ ! বুঝিয়ে বলব।

দুটো দিনই যথেষ্ট। এই দুদিনে অমলেন্দু বেশ চলাফেরা করতে পেরেছিল। হাসপাতালের মাঠে এসে বিকেলবেলায় বসত। স্টাফদের সাথে গল্প গুজব করত। অবশ্য তার মনের দিকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হত। এই দুদিনের একদিনও কণা হাসপাতালে আসেনি। অমলেন্দু উৎসুক ভাবে তার আগমন প্রতীক্ষা করেছে। আগামীকাল সকালে তার ছুটি। মিস্ মজুমদারের সামনে দাঁড়িয়ে তার সেবার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা জানানো তার ধর্ম কিন্তু কণা না আসাতে সে মনের

কথা বলতে পারছিল না। অধৈর্য হয়ে ওয়ার্ড'বয়কে জিজ্ঞেস করেছিল মিস্ মজুমদারের ডিউটি নেই? ওয়ার্ড'বয় বলেছিল, দিদিমণি ছুটিতে আছে। এরপর আর প্রশ্ন করেনি। চুপ করে বিদায়ের ক্ষণ গুনছিল।

কণা দুদিন ক্যাজুয়াল লিভ্ নিয়ে কোয়ার্টারেই ছিল। দুদিন পরে নাইট নিয়েছে সে। তার আগেই অমলেন্দু বিদায় নেবে। আর তার সাথে দেখা হবে না। এইটেই সে চেয়েছে, সেই অনুসারেই ছুটি নিয়েছে এবং ডিউটি ঠিক করেছে। তার সাথে দেখা হলে অযথা মায়া বৃদ্ধি হবে, সে মায়ার বাঁধন ছেঁড়া হয়ত সহজ হবে না। তাই দুটো দিন বসে বসে কুরুস কাঁটা দিয়ে লেস্ বুনেছে। সময় কেটেছে এই ভাবেই।

তৃতীয় দিনের সকালবেলায় দরজায় কড়া নাড়তেই কণা দরজা খুলে দাঁড়াল।

সামনে অমলেন্দু দাঁড়িয়ে। প্রথম দিনের সেই মলিন বেশ। সেদিনের মত শীর্ণ দেহ। চমকে উঠল কণা।

নমস্কার। হাত তুলে নমস্কার করল অমলেন্দু। আমার ছুটি হয়েছে তাই আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। আপনার ঋণ এ-জীবনে শোধ দিতে পারব না। বলতে বলতে থমকে গেল। কণার মুখের রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। সেই ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে অমলেন্দুর কন্ঠরোধ হয়ে গেল।

কণা অমলেন্দুকে বসতেও বলল না, কোন উত্তর দিল না। ভদ্রতার খাতিরে নমস্কার করাটাও তার কাছে অবান্তর মনে হল। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে।

অনেক শুনেছি আপনার কথা। মিসেস্ ঘোষ বলেছেন, ডাক্তার পাল বলেছেন। আপনার মঙ্গল হোক। আমার দোষ-ত্রুটি মার্জনা করবেন, নমস্কার। মুখস্ত জবানবন্দী শেষ করল অমলেন্দু। উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ফিরে দাঁড়াল।

সিঁড়ি বেয়ে অমলেন্দু নামতে লাগল।

কণা ডাকল, শোন।

আমাকে ডাকছেন? মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল অমলেন্দু।

হাঁ।

বলুন।

এখন কোথায় যাবে ?

জানি না। সারা ভারতের কোন্ ঠাঁইতে, ঠিক নেই কিছুই !

জীবিকা।

ছিল, এখন নেই। তাই ভয়ও নেই।

চেয়ার দেখিয়ে কণা বলল, বস।

ধীরে ধীরে অমলেন্দু এসে বসল চেয়ারে।

পাথেয় আছে কি ?

প্রয়োজন নেই। পা থাকলে পাথেয় জুটবেই !

ভণিতা না করে কথা বলতে বুঝি পার না। সহজভাবে কথা বল দেখি। বলতে বলতে কণা বিছানার তলা থেকে দু-তিনখানা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বলল, তোমার পকেটে এই কাগজগুলো ছিল।

অমলেন্দুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

তোমার লেখা।

হাঁ।

তুমি কবি। এ কবিতা তোমার লেখা. বলতে বলতে একখানার ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল :

ভালবাসাবিহীন যে রূপ
সে-রূপে রয়েছে অগ্নিদাহ।
দুপুরের অগ্নিতপ্ত পীচ ঢালা পথে -
খোলা পায়ে হেঁটে চলা—

বাধা দি'য় অমলেন্দু বলল, থামুন। ও কবিতা শোনাবার জন্য লিখিনি।

মানুষেব হৃদয়ের কথা ফুটে ওঠে তাব কাব্যে সাহিত্যে, তোমার মনের ব্যথাও কি ফুটে উঠেছে এতে।

জানি না। মাটির দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলল অমলেন্দু।

আজ তোমার যাওয়া হবে না।

কণার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল অমলেন্দু। সেদিন বসে থাকতে দেখে যেমন অভিভাবকের মত শাসানি শুনিয়েছিল, এ শাসানি তেমনি কঠোর।

আমি তোমাকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। আমার দাবি সবচেয়ে বড়

দ্যাৰ। ডাক্তার পাল তোমাকে ছুটি দিলেও আমি তোমাকে ছুটি এখনও দিইনি।

কি বলছেন মিস্ মজুমদার!

কণা নিজেও ভেবে পেল না হঠাৎ আত্মহারা হয়ে একি করে বসল সে। লজ্জায় আর ক্ষোভে তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। কণা মুখ ফিরিয়ে বলল, হয়ত ভুল বলেছি; তবুও নেমতন্ন আর ফেরত নিতে পারব না কবি। তুমি কবিতা লিখবে, আমি শুনব। যতদিন খুশি আমি শুনব। যেদিন ক্লান্তি আসবে আমিই তোমাকে ফেরবার পথ দেখিয়ে দেব। সেদিন তোমার ছুটি।

সারাদিন বসে পরিপাটি করে রাঁধল কণা। গরম জল করে স্নান করতে দিল অমলেন্দুকে। হাটতলার কাপড়ের দোকানে গিয়ে নিজেই কিনে আনল একজোড়া ধুতি। নতুন পোশাক পড়িয়ে তাকে খেতে বসাল তার সামনে। মেঝেতে বিছানা পেতে দিয়ে বলল, এবার বিশ্রাম কর।

অমলেন্দু চোখ বুঁজে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। কণা ব্যস্ততার সাথে রাতের রান্না শেষ করছিল। অমলেন্দুকে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি চায়ের কেটলি তুলে দিল আখায়। বিনা ভূমিকায় অমলেন্দুকে বলল, আমার নাইট আছে। তুমি খেয়ে-দেয়ে বেশ শুয়ে থাকতে পারবে। কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না। ঐ যে সেলফে ক'খানা বই আছে। দরকার হলে নিয়ে পড়তে পারবে। সময় কাটবে। অজ গাঁয়েতো আর বেড়াবার জায়গা নেই, ঘরে শুয়েই কাটাতে হবে। কেমন।

উত্তরের অপেক্ষা না করে কণা ফিরে গেল রান্নাঘরে। ফিরে এসে চায়ের বাটি সামনে রেখে বলল, এবার হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নাও। আটটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে আমি বের হব। তোমার খাবার ঢাকা থাকবে। ইচ্ছে মত খেও।

অমলেন্দু চুপ করে শুনল, কোন জবাব দিল না।

কণা চলে যেতেই বই নিয়ে বসল।

বইয়ের দিকে চোখ রেখে এক লাইনও সে পড়তে পারল না। অদ্ভুত

লাগল মেয়েটাকে। একটু একটু করে মনে পড়তে লাগল। শিমুল গাছতলা থেকে কুড়িয়ে এনে কেনই বা হাসপাতালে ভর্তি করেছিল, কেনই বা অক্লান্ত সেবা করেছিল। আর কেনই বা আজ তাকে আটকে রাখল। বিশ্লেষণ করতে বসে ভেবেই পেল না এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা। আজ সকালে তারই কবিতা পড়ছিল কণা। তাতে ভালবাসাহীন রূপকে সে ঘৃণা জানিয়েছে। এ রূপের সাথে কি ভালবাসা মিশে আছে? অণুবীক্ষণ দিয়েও বোধহয় তা দেখা যাবে না। অমলেন্দু ভেবেই পেল না, এই নারী কি বলতে চায়। হতাশভাবে বই খুলে রেখে লণ্ঠনের দিকে চেয়ে রইল। চোখ ভেঙ্গে ঘুম নামতেই শুয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙ্গল টেবিল ক্লকে তখন রাত তিনটে বেজে গেছে। খাবারের পাশে জল ঢাকা ছিল। উঠে এসে ঢক, ঢক্ করে জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কেমন গুমোট গরম সে অনুভব করছিল। সব জানলা খুলে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘুম আর এল না চোখে। রাজ্যের চিন্তা জুটল তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে। ঠাণ্ডা মাথা ক্রমশ গরম হয়ে উঠতেই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট বারান্দাটায় পায়চারি করতে করতে পূব দিকটা লাল হয়ে উঠল, পাখিরা গা ঝাড়া দিয়ে তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করল। সকালের সেই লালিমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সূর্য উঠল, জীবজন্তু নরনারী ব্যস্ত হয়ে উঠল। অমলেন্দু নির্বিকার ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল। সে অতীতের অন্ধকারে ডুবে গেছে, মাঝে মাঝে বর্তমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। এ ধ্যান ভাঙ্গত না। ভাঙ্গল কণার ডাকে।

এখানে দাঁড়িয়ে কেন? রাতে খাওনি?

অমলেন্দু ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসল।

কণার মুখের ওপর দৃষ্টিস্থাপন করে বলল, খিদে ছিল না। বই পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন রাত তিনটে বেজে গেছে, শেষ রাতে খেয়ে শরীরটা অসুস্থ করতে চাইনি। আগে হলে খেতাম, এখন কেমন মায়া জন্মেছে নিজের ওপর।

কণা মৃদুস্বরে বলল, তুমি একটু বারান্দায় দাঁড়াও। আমি কাপড়-জামা বদলে নেব।

অমলেন্দু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

সামনের খোলা মাঠে তখন একপাল গরু নিয়ে রাখাল ছেলেরা ছুটোছুটি করছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। আবার কণার ডাক শুনে ভেতরে এল, বলল, আজ আমাকে নিশ্চয়ই ছুটি দেবেন।

কণা স্টোভ জেবলে চা করছিল। বলল, ছুটি চিরদিন দিয়েছি। যেতে যদি চাও নিশ্চয়ই ছুটি দেব। এখন চা খাও। দুপুরে খেয়ে-দেয়েই না হয় যেও। কেমন।

অমলেন্দু চায়ের বাটিতে চুমুক দিতেই কণা জিজ্ঞেস করল, একটা কথার সোজা উত্তর দেবে।

একটা কেন, হাজারটার উত্তর দেব। সোজা-বাঁকা আপনি ঠিক করে নেবেন।

তুমি পথে পথে ঘুরছ কেন?

পথ আমাকে হাতছানি দেয়, তাই।

ঘর কি তোমার নেই।

চুপ করে গেল অমলেন্দু।

বল।

ছিল।

এখন কি নেই।

না। বলে অমলেন্দু দড়ি থেকে জামাটা টেনে নিতেই কণা বলল, তুমি কি এখনই যাবে?

তাই তো মনে করেছি।

বললাম যে এ বেলায় খেয়ে দেয়ে যাবে। রাতে তোমার খাওয়া হয়নি আমার আজ ইভনিং বারটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ হবে।

অমলেন্দু অসতর্কভাবে বলল, কেন মায়াবৃদ্ধি করছেন।

সে তুমি বুঝবে না। বলেই কণা রাস্তার দিকে নজর দিল।

অমলেন্দু মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, সারারাত জেগে এসে আবার কেন হাঙ্গামা করছেন। আপনি বিশ্রাম করুন। অনর্থক তাড়াহুড়া করে কষ্ট পাচ্ছেন কেন।

পেটে দানা তো দিতে হবে।

আজ সে দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার সংসার একবেলাটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি।

অন্য কেউ বললে খুশি হতাম। তোমার হাতে সংসার ছেড়ে দেবার সময় এখনও হয়নি।

অজ্ঞাত কুলশীল বলে।

তুমি অজ্ঞাত কুলশীল নও। জ্বরের ঘোরে তুমি যা বলতে সব আমার মনে আছে। তা থেকেই তোমার মনের ঠিকুজি আমি তৈরি করেছি।

সত্যি! হাসল অমলেন্দু।

তাই তোমাকে যেতে দেবার ইচ্ছে নেই। অন্তত একটা বেলা এখানে থেকে যাও।

একটা বেলা কেন, বহুবেলা থেকে যেতে পারি, কিন্তু তাতে লাভ কি!

লাভ! সারা জীবন কি লাভের হিসাব করে পথের হাতছানি দেখেছ। তোমাকে দেখে অবধি মনে হয়েছে, একটা ছন্নছাড়া জীবন ঝড়ের মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের তলায় আশ্রয়ের আশায়।

কি করে বুঝলেন!

বললাম যে তোমার পাশে বসে তোমার কথা শুনেছি। আচ্ছা সুলতা কে?

আমার মেয়ে।

কোথায় সে!

বিয়ে দিয়েছি। চলে গেছে নিজের ঘরে।

আর কেউ নেই বুঝি!

অত জানতে চাইছেন কেন?

কেন! গম্ভীর ভাবে কণা বলল, তোমার মত ঘরছাড়া একটি মানুষের মেয়ে আমি। ঘর ছাড়া আমি নিজেও। আমি বুঝি ঘরভাঙ্গা আর ভাঙ্গা ঘরের পার্থক্য কত। বের হয়েছি ঘরের সন্ধানে। সোজা কথায় আমি বেরিয়েছি পথের সন্ধানে। একদিন আশার স্বপ্নে মাতোয়ারা ছিলাম, সেদিন ঘরের নেশায় যেন পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তারপর যখন ঘরের সন্ধ্যান পেলাম, দেখলাম সে ঘর বালিচরার ঘর। চোরা-বালিতে চাপা পড়েছে। সেদিন বুঝিনি আঘাত আসবে, সেই আঘাতে

আমি তছনছ্ হয়ে যাব। কর্ণের মত পরিচয় চলবে সম্মুখে, জন্ম বৃত্তান্ত আর কর্ম চাপা পড়বে মানুষের ঘৃণার তলায়। সেকথা ভাবিনি। তারপর! যাক্ ওসব কথা। আমিও খুঁজেছি ঘরভাঙ্গা একটা মানুষ। তাই রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম তোমাকে। যদি অসুবিধা না হয় তা হলে থেকে যাও কয়েকটা দিন। অবশ্য হাসপাতালের আইনে তা রুচি বিরুদ্ধ, তবুও এই কয়েকটা দিনের জন্য অনুমতি নেব। তুমি কবিতা লেখ, আমি শুনব সেই কবিতা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, মনের ভাষা কলমে যদি ফুটিয়ে তুলতে পার তাহলে আমার কথাও লিখ। আমি আর তুমি গলায় গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করব সবার সামনে। আমার পরিচয় আর তোমার পরিচয়? পেছনে তাকাবে না, সামনেও চলবে না। বর্তমানকে সাজিয়ে গুছিয়ে যাত্রা হবে শুরু। কেমন!

আট

কাগজ-কলম সঙ্গী। হিজি-বিজি লিখে চলেছে অমলেন্দু। সারাদিন যা সে লেখে তা শোনাতে হয় কণাকে প্রতি সন্ধ্যায়। রাঁধতে বসে কণা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে অমলেন্দু।

কবি তার কবিতা পড়ে। কণা শোনে, গৃহস্থালীর কাজ করে। আটটা বাজলেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে যায় সুচরিতার ঘরে। সেখানেই রাত কাটায়। যেদিন নাইট থাকে সেদিন কোন হাঙ্গামা থাকে না, যেদিন মর্ণিং থাকে সেদিন সকাল পাঁচটা না বাজতেই ডেকে তোলে অমলকে।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করেছিল, বুড়োর যে রসের নাতনি সেজে বসেছিস। ভালবেসেছিস বুঝি! আচ্ছা তোর রুচি। ছোঁড়া বাদ দিয়ে বুড়ো। ডাক্তার পালকে ইসারা দিলে মাথায় তুলে নাচত সে। ও দিকেই একটু দেখ।

কণা হাঁ-না কিছুই বলেনি! সামান্য হাসি দিয়ে সব বক্তব্যর সমাধান করেছে।

সুচরিতা সেদিন ডেকে বলল, দীপা কাল আসবে।

জানি। মায়ের চিঠি পেয়েছি। সঙ্গে আসছে আমার পিসি। বেশ হবে এবার। পিসির একটু কাব্যিক মন আছে। মিলবে ভাল। বি-এ পাশ করেছে, অমলেন্দু অবসর সময়ে কাব্যচর্চা করতে পারবে।

দেখিস হাতছাড়া যেন না হয়। ভাইঝি-পিসির দাঙ্গা না হয়।

ও যে বুড়ো।

তাই ভরসা। হাসল সুচরিতা।

হেঁস না সুচিদি। কোথাও কোন দুঃখ নেই আমার। পাখি খাঁচায় ভর্তি করলেই পোষ মানে না। উড়া পাখি উড়েই যাবে। তবুও কটা দিন ছাতু-ছোলা খাইয়ে সুখে আছি। সেটা তোমার বুঝি সহ্য হচ্ছে না। এই তো জীবন। খেলার ঘরে খেলে বেড়াচ্ছি। মরলে খেলা শেষ হবে।

পরদিন দুপুরে দীপালি এল সঙ্গে শোভা।

শোভা প্রাণদাচরণের বোন! কণার রক্ত সম্পর্কে পিসি নয়। বয়সেও সমবয়েসি। বেশ গোলগাল সুন্দর চেহারা। কেমন একটা সরলতার ছাপ রয়েছে মুখে। সবে কলেজের পড়া শেষ করেছে। কথা-বার্তায় চটপটে, চলনে বেশ একটা মধুর ছন্দ, পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। তার জীবনে কলকাতার বাইরে এই প্রথম পদার্পণ। জানবার আগ্রহ তার চোখে-মুখে। গ্রাম্য পরিবেশ তার মনটাকে যেন উদার করে তুলেছে। গ্রাম্যপথে আসতে আসতে পরিতৃপ্তির ছাপ মেখেছে সর্বাঙ্গে। কণা তার অপেক্ষায় বসেছিল। ছুটে এসে জাপটে ধরল তাকে। শোভাও আনন্দের আতিশয্যে গালের ওপর গাল রেখে অনুভব করছিল আনন্দমুহূর্তের আবেগ।

অমলেন্দু এই মিলন দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করছিল। সে তাদের এই আবেগময় অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। শোভার নজর পড়ল তার ওপর, কণাকে ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, কে?

কণা হেসে বলল, বন থেকে পাখি ধরে এনেছি, ছাতু-ছোলা খাওয়াচ্ছি। ক'দিন থাকলেই বুঝতে পারবি কে। পাখির সাথে তুইও যেন উড়ে বেড়াসনে।

অমলেন্দু হেসে ফেলল কণার পরিচয় দেবার ভঙ্গিতে। বলল, তার চেয়ে বলুন একটা ভিখিরিকে চাট্টি খেতে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি।

ছিঃ, কৃত্রিম কোপে উত্তর দিল কণা।

লজ্জিত হল অমলেন্দু। তার মুখের হাসি মিইয়ে গেল।

সহজে সরলভাবে শোভা বলল, দুটোই এক কথা। এখন খেতে দে কণি। বাপ্ রে কি রাস্তা। শেষ হতেই চায় না। এই ট্রেন, এই জাহাজ, এই বাস, এই গরুর গাড়ি, বাবারে বাবা। তা আছিস ভাল। হাঁরে এখানে শেয়াল ডাকে?—ডাকে। এই সেরেছে। রাতে বের হব কি করে! তোরা থাকিস কি করে। হনুমান আছে নিশ্চয়ই। তা থাকবে বই কি। এ সব জঙ্গলে হনুমানই থাকে। তোরাও হনুমান হয়েছিস, শুধু লেজটা নেই। তা নইলে এখানে থাকতে পারতিস কি!

কি যে বলিস পিসি। বাংলাদেশটাতো কলকাতা নয়। এই রকম গ্রাম নিয়েই বাংলা। গ্রামগুলো আছে বলেই তো কলকাতা আছে। কলকাতা কি চিরকাল অতবড় শহর ছিল। সেও তো ছিল সুন্দরবন।

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে কণা শোনাল তার পুরো এক বছরের ইতিহাস। অমলেন্দু সম্বন্ধে কোন কথাই সে বলল না। কথা শেষ হবার সময় বলল, অমলেন্দু বড় গুণীলোক, কবিতা লেখে। রোজ রোজ নতুন নতুন কবিতা শোনাবে, বুঝলি।

বয়স্ক লোকটার নাম ধরে ডাকিস কেন?

ও এসেছিল ভিখিরির মত, তখন ওকে 'তুমি' বলতাম, সেটা আর ফিরিয়ে নিতে পারিনি। ওকেও বলেছি 'তুমি' বলতে, ও রাজি হয়নি।

Complex—বলে কপট গাম্ভীর্যে শোভা চেয়ার টেনে বসল।

অমলেন্দু হেসে বলল, Superiority অথবা Inferiority, কোনটা?

দুটোই। যেটা যখন দরকার হয় সেটা বুঝলেন!

সেদিন সন্ধ্যায় শোভা ধরে বসল, অমলদা কবিতা শোনান।

কবিতা! অমলেন্দু হাসল।

হাঁ কবিতা।

মানুষের জীবনে কোন কাব্য নেই বোন, সবই গদ্য। কবিতা কোথায় পাব।

বা, কণি বলল রোজ আপনি কবিতা লেখেন।

রোজ লিখি আবার ছিঁড়ে ফেলি। আজতো লেখার সময় পাইনি। আপনি এসে আমার কাব্যকুঞ্জে যত গাছপালা ছিল সব ভেঙ্গেচুড়ে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছেন। আজ আর কবিতা কলম দিয়ে বের হবে না।

বেশ, কাল কিন্তু শোনাতে হবে।

কাল। জানেন তো সেই টু-মরো।

সবে কলেজ থেকে আসছি, কেন জানব না। তার সাথে আশাটাও তো থাকে।

আশা নিয়েই থাকুন।

পরদিন সন্ধ্যায় কবিতা শুনতে চাইল শোভা। অমলেন্দু একটুকরো কাগজ বের করে বলল, পড়ুন।

কবিতা পড়ে শোভার পছন্দ হল না। বলল, এটা কি ছাই লিখেছেন। চার লাইনের কবিতা তাও দুঃখের। আমার বিদায়ক্ষণে দাঁড়াও, পরশ না দিয়ে—ছাই এটা। সবে মাত্র এলাম, এখুনি বিদায়ক্ষণ। অভিনন্দন কিছু লিখুন : তুমি যবে এলে মোর দ্বারে, আমি সচকিতে চাহিনু ফিরে —এই রকম। বুঝলেন।

শোভা আসবার পর কিছুটা পরিবর্তন ঘটল কণার সংসারে।

নাইট থাকলে শোভা চলে যেত দীপালির ঘরে। সেখানেই সে রাত কাটাত। যেদিন নাইট থাকত না সেদিন কণা আর শোভা থাকত খাটে, অমলেন্দু থাকত মেঝেতে।

দীপালি আসা অবধি বেশ হেসে-খেলেই কেটেছে। শোভাকে কাছে পেলে মন খুলে গল্প করে। শুধু শোনায় তার মেয়ের কথা আর মমতাময়ীর নিঃস্বার্থ সেবার কথা। কণার প্রতি তার জন্মেছে অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাবোধ, সে কথাই বার বার শোনায়। আর শোনায় কি করে তার মেয়েকে বড় করবে, কি করে নতুন করে সংসার পাতবে। আরও কত কি—যার মাথা-মুণ্ডু কিছুই থাকে না। গল্প শুনতে শুনতে শোভা ক্লান্ত হয়ে যায়, কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় তা টেরও পায় না। শোভা আজকাল দীপালির কাছে শুতে যেতে চায় না। বলে, কণি তুই নাইট নিস নারে।

না নিয়ে উপায় আছে কি? নিতেই হবে। চাকরি যে পিসি।

শোভা নিরুপায়। মাঝে মাঝে সুচরিতার কাছে গিয়ে শোয়।

সেদিন ছিল নাইট। শোভা গেছে সুচরিতার কাছে।

অমলেন্দু বুকের তলায় বালিশ দিয়ে নিজের মনে লিখে চলেছে। লেখা শেষ ক'রে সবেমাত্র আরম্ভ করেছে আবৃত্তি, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

অমলেন্দু দরজা খুলেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে কণা।

সহাস্যে কণা জিজ্ঞাসা করল, কি পড়েছিলে কবি ?

নতুন একটা কবিতা।

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। তুমি আবার পড়, আমি শুনব।

অমলেন্দু পড়ল :

সামান্য ব্যবধান ! দ্বারের ওপ্রান্তে তুমি এপ্রান্তে আমি,
আঁধার এসেছে নামি,
চেনা যায়না কে কোথায়। তুমি রুদ্ধশ্বাস
হৃদয়ের বিশ্বাস
বুঝি ভেঙ্গে যায় শক্ত ঐ কাঠের ব্যবধানে
নিভৃত গোপনে
তোমার বাসনা। শত জীবনের জাগ্রত বুভুক্ষা
উপহসি তিতিক্ষা।
আমি
আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা দিবা যামি,
অবশেষে
রুদ্ধ দ্বারে দিনু আঘাত ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে।
আলোর অঞ্চল খুলি
বক্ষে বুঝি ব্যাকুলতার স্পন্দন তুলি
চুমিলাম
তব ওষ্ঠাধরে শত ব্যবধান ভুলিলাম।

কণা জিজ্ঞাসা করল, এই শেষ।

না, আরম্ভ। ফিরে এলেন কেন ?

শরীরটা ভাল নেই। এলিসকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছি আমার

রাতের ডিউটি করতে। বলতে বলতে দাঁড় থেকে কাপড় জামা টেনে নিয়ে বারান্দায় গেল কণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড়গুলো বদল করে এসে বসল অমলেন্দুর বিছানায়। অমলেন্দু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এলিসের ঘরে যাবেন ?

না।

শোভাকে ডাকবেন বুঝি।

না। একাই থাকব তোমার পাশে। ব্যবধান ভেঙ্গে গেছে।

সেকি ! কম্পিতকণ্ঠে অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

বিস্মিত হচ্ছ। তা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কবি, আজ সারারাত তোমার কবিতা শুনব। আমি চোখ বুঁজে শুনব, তুমি শোনাবে কল-কাকলিতে, শুনব রুদ্ধশ্বাসে।

আমি শোনাব কিন্তু কাল সকালে কি উত্তর দেবেন।

কিসের উত্তর। আমরা এক ঘরে রাত কাটিয়েছি, এই তো। যা সত্য তাই বলব। মিথ্যা দিয়ে নিজেকে মিথ্যার বেসাতিতে ঠেলে দেব না। বলব সারারাত কবির কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা শুনেছি।

ভবিষ্যত ?

আমার ভবিষ্যত তুমি গড়ে দিও।

আমি অক্ষম। আজ রাত যদি এভাবে আমাকে কাটাতে হয় কাল সকালেই কাজলদীঘির মায়া কাটিয়ে আমাকে পথে বের হতে হবে। আমি পারব না আপনাকে লোকের সামনে ছোট করে দিতে। এত বড় অন্যায় ও অবিচারকে সহ্য করতে পারব না।

অপরাধ !

অপরাধ আপনার নয়, আমার। যদি দেবার সামর্থ্য থাকত আমার তা হলে অপরাধ নিয়ে বিচার করতাম না। বুক ফুলিয়ে বলতাম। মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতাম। কিন্তু আজ যে আমি নিঃস্ব। জীবনে দিয়েই এসেছি, পাইনি কিছু, সঞ্চয়ও নেই মোটেই। শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে বেরিয়েছি। পেয়েছি হতাদর আর লাঞ্ছনা। তবুও এখানে এসে মনে হয়েছিল যেন নতুন জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছি, আবার বোধহয় পদক্ষেপ করবার সুযোগ পাব। সে সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

কণা হাসল, বলল, পরিচয় দেবার সাহস নেই তোমার।

নিশ্চয় আছে। সমাজে ভাললাগা আর ভালবাসা একবস্তু নয়। বড় প্রশ্ন রয়েছে পরিচিতির। সে পরিচয় যেখানে ঝাপসা সেখানে সুস্থ মন সব কিছু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে না।

কাল সকালে আমি যদি পরিচয় ছড়িয়ে দেই। তোমাকে সারা-জীবনের সঙ্গী বলে দাবী করি, তা হলে এই দ্বিধা মুক্ত হতে পারবনা কি!

এ প্রশ্নের সমাধান এভাবে হয় না। উত্তেজনায় কিছু করে বসলে তার ফল ভাল হয় না কোনদিন। আমাকে কতটুকু জানেন? প্রথম জীবনের ভুলের মাশুল গুনে গুনে দিয়েছি, শেষ জীবনে আর ভুল করতে সাহস পাই না। আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালও বাসি। সেই শ্রদ্ধা আর ভালবাসা আপনাকে সবার চোখে যদি হেয় করে তার চেয়ে দুঃখের কিছু আছে কি?

কণা উত্তেজিত ভাবে বলল, হেয় না হয়ে মহান হতেও তো পারে।

হয়ত পারে, তা বলে অমঙ্গলকে বাদ দিয়ে কেমন করে চলি।

পেছনে কোনদিন তাকাইনি। আজ তাকিয়ে দেখছি, অমঙ্গল আমার চির সাথী। তাকে বাদ দিয়ে চলতে আমি পারিনি, পারবও না। তোমার অমঙ্গলের সাথে আমার অমঙ্গল মিশিয়ে দিতে চাই। মিশিয়ে দিতে পারবে না কবি?

অমলেন্দু অসহায়ের মত বলল, আপনার মহত্ত্ব দিয়ে মনের গ্লানি মুছে ফেলুন। আমার মত লোককে অনুকম্পা করা যায়, হয়ত ভালবাসা যায় কিন্তু আমাকে নিয়ে ঘর করা যায় না। যে তা করতে চায়, তার তৈরি ঘর ভেঙ্গে যায়। এ হঠকারিতা করবেন না আপনি।

কিন্তু।

কিন্তু নেই। সহজ সরল ভাবে আপনাকে আমি বুঝেছি, মনের সাথে গ্রহণও করেছি। আমাদের পরস্পরের প্রতি যে প্রীতি ও হৃদ্যতা তাকে লোকচক্ষে নিন্দার কারণ করতে চাই না। এইটুকুই আমার লাভ, আর এটুকুতেই শেষ। আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

কণা ধীরভাবে বলল, আমি বিদ্যালয়ের ছাত্রী নই, তুমিও শিক্ষক নও। আমি এসেছি একটা ব্যথাদীর্ণ মন নিয়ে শান্তির নিকেতন খুঁজতে, তুমি বের হয়েছ শান্তি ও সান্ত্বনার আলয় পেতে। ভিন্নমুখী নয় আমাদের

চিন্তাধারা। আমরা এক যোগে অভিন্ন চিন্তা নিয়ে চলতে চাই জীবনে। তোমার সম্মতি শুধু চাই।

মন বলছে, আজকের ভালবাসা কালতো তিক্ত হতে পারে।

পারে। সচল মন অচল হয়ে উন্মুখ হয়ে থাকে স্নেহের পরশ পেতে। সে স্নেহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই।

আমার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে।

কারও দিনের গুণতি কেউ করতে পারেনি আজও। সমাজের প্রয়োজন আমাদের মত ক্ষুদ্রকে নিয়ে নয়। কিন্তু তোমার সমষ্ঠিগত জীবনের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের স্বার্থে। সেই প্রয়োজন মেটাতে হবে অমলেন্দু। তুমি ভুল বুঝ না।

অমলেন্দু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল!

কি ভাবছ?

ভাবছি আমার সঞ্চয় নেই, আপনি সঞ্চয়ের পথ বুঝি খুলে দিতে চান। কোন নারী যে কাউকে ভালবাসে একথা বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি, সেই বিশ্বাস কি ফিরে আসবে।

হয়ত আসবে।

সকাল হয়েছে, চলুন বাইরে যাই।

চল।

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াল।

কণা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি চাও।

আমি চাই না কিছুই তবে দাতার দেবার সামর্থ্য থাকলে আমার চাওয়ার শেষ নেই। পারবে তুমি অকৃপণ ভাবে সব কিছু আমাকে দিতে।

দৃঢ়তার সাথে কণা বলল, পারব।

পারবে ভুলতে অতীতকে। তুমিই তো তোমার পরিচয়! কেমন! পারবে আমার সাথে এক ও অভিন্ন হতে, পারবে তুলে দিতে সব সম্পদ। পারবে আমার দেওয়া আঘাত সহ্য করতে। বিনিময়ে কিছুই পাবে না তুমি। পারবে সব ত্রুটি বিচ্যুতিকে মার্জনা করে আপন করে নিতে?

পারব। যখন সব উজাড় করে দেব তখন নেবার মত যোগ্যতাও আমার থাকবে।

কেন। বলে চুপ করে গেল অমলেন্দু। তার মনের হদিস সে নিজেই খুঁজতে থাকে।

কণা নিজের মনে মনে বলতে থাকে, আমি ভক্তি দেব, শ্রদ্ধা দেব, ভালবাসা দেব, আমার সমস্ত চিন্তা, আমার সমস্ত পার্থিব সম্পদ—সব কিছু দেব। সব দিয়েও কি তোমাকে আপন করে নিতে পারব না?

কি বলছ কণি। মেয়েরা ভালবাসতে জানে না। আশ্রয় খোঁজে, তারজন্য অভিনয় করে। একি অভিনয়! না ঠিক!

ঠিকই বলছি। মুখের ভাষায় মনের ভাষা ফোটে না অমল। সকালের সূর্য সাক্ষী। আমার বলতে কিছু না রেখে সব কিছু তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি শুধু অভিমান করে দূরে চলে যেও না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমলেন্দু বলল, বেশ।

এবার তোমার বক্তব্য শুনতে চাই। মেয়েদের প্রতি যে বীতরাগ তার সমাপ্তি ঘটুক।

যদি কোনদিন অবজ্ঞা অথবা অবহেলা না কর আমি রইব তোমার পাশে, সুখে দুঃখে।

কণা সকালের সূর্যকে প্রণাম করল হাতজোড় করে। বলল, সূর্য সাক্ষী।

নয়

আমি কদিন বেরিয়ে আসতে চাই, বলল অমলেন্দু।

শোভা হেসে বলল, আমাকে সঙ্গে নিতে হবে।

অমলেন্দু বলল, পথে নারী বিবর্জিতা।

আমি নারী নই, নর। আমাকে বর্জন করলে পথে পথে বিপদ। আপনি বেভুল মানুষ, আপনাকে খাইয়ে পড়িয়ে চালিয়ে নেবার লোক চাই। নইলে যা শুনেছি তাতে মনে হয় আবার কোন শিমুলতলায় মুখ থুবরে পড়ে থাকবেন।

শোভার বলার ভঙ্গিতে অমলেন্দুও হাসল, কণাও।

তোমার কি মত কণি!

তা একটু বেরিয়ে এস, তবে ঠিকানা দিও।

অমলেন্দু হেসে বলল, ভয় নেই, পালাব না। পালাবার আগে ছুটি চাইতাম।

পরদিন সকালে সূর্য উঠবার আগে অমলেন্দু প্রস্তুত হয়ে নিল।

আবার সেই সূর্যোদয়ের মুহূর্ত। দরজার সামনে এসে অমলেন্দু ফিরে তাকাল কণার দিকে। সজল নয়নে কণা তাকিয়ে ছিল তার পথের দিকে। শোভা দাঁড়িয়েছিল স্থিরভাবে।

অমলেন্দু বলল, তা হলে আসি।

কণা ছুটে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সোজা দাঁড়িয়েই মুখ লুকাল অমলেন্দুর বুকে। অতি সন্তর্পণে অমলেন্দু কণার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, অধৈর্য হয়ো না। বলেই ধীরে ধীরে নেমে গেল মাঠের পথে। পাশে পাশে চলতে চলতে কণা পীচের রাস্তা অবধি এল। সূর্য তখন সবে পূব আকাশে দেখা দিয়েছে, কণা ক্ষীণকণ্ঠে বলল, সূর্য আজও সাক্ষী।

অমলেন্দু হেসে এগিয়ে চলল। কণা তার পথের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। শোভাও ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে কণার পাশে। ডাকল, ফিরে চল্ কণা।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছে কণা বলল, চল্।

অমলেন্দু চলে যাবার পর আবার পরিবর্তন দেখা দিল কণার সংসারে। রান্নাবাড়ির চার্জ বুঝে নিল শোভা। কণা নিয়ে বসল সেলাইয়ের কাজ। আগের চেয়েও চঞ্চল ও হাসি-খুশি হয়ে পড়ল সে। শোভা একমাত্র ব্যক্তি যে তাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, সব বুঝেও সে চুপ করেই রয়ে গেল।

তোর এত আনন্দ কেন রে কণি? জিজ্ঞেস করেছিল দীপালি।

উত্তর দিয়েছিল সুচরিতা, বুড়োটা দূর হয়েছে বলে।

তা বটে, বলে কণা মাথা নাড়ল।

অনেকদিন পর শোভা আর কণা বসল প্রাণখুলে গল্প করতে।

শোভাই উত্থাপন করেছিল কথাটা, কণা শুধু জবাব দিয়েছিল। শোভা বলল, অমলেন্দুর সঙ্গে তোর relation-টা একটু ঘোরাল মনে হচ্ছে।

কণা হেসে বলল, মোটেই নয়। সহজ সরল relation, তোর চোখে ভাল লাগেনি, এই তো।

কারও চোখেই ভাল লাগবে না।

তবুও সত্যি।

শোভা বলল, বউদি শুনলে দুঃখ পাবে।

কেন ?

পাত্র নির্দ্ধারিণে ভুল হয়েছে বলে।

সুপাত্র যে কে তা স্থির কে করবে ? তুই কি ভালবাসিস কাউকে ? ভালবাসিসনি। যেদিন ভালবাসবি সেদিন রূপকে না ভালবেসে গুণকে ভালবাসিস তাহলে পাত্র নির্দ্ধারিণে ভুল হবে না। আমারও ভুল হয়নি। আমার মা একথা স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। একটা আত্মভোলা লোক, ওকে নিয়ে কষ্ট বেশি। অভিমান সম্বল করে আঘাত দেবে, তাও সইতে হবে। ও ছুটবে পেছনে আমিও ছুটব। এইতো পরিস্থিতি।

শোভা কোন উত্তর না দিয়ে পুরানো একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিল। কণা মোলায়েম সুরে ডাকল, পিসি।

কেন রে ?

অমলেন্দুর চিঠি আসেনি অনেক দিন। পনর দিন কেটে গেল, কোন সংবাদ জানি না। কোথায় যে গেল ! কি জানি বাপু কেমন যে লোক। এমন পাগল নিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই।

শোভা মনে মনে হাসল। বলল, এখুনি এতো সবে শুরু। ভালবাসা ব্যাধি। তোর নিরাময় ঘটুক।

শুরুতেই কণা হাঁপিয়ে উঠল। অমলেন্দু যাবার পর যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল তা লোপ পেতে লাগল। রোজই দিনক্ষণ গুনছে আর প্রতীক্ষা করছে ডাক পিওনের আশায়।

শোভা লক্ষ্য করে ঠাট্টা করেছে। কণা হেসে বলেছে, রোগা মানুষ, বুঝতেই পারছিস। মনটা ভাল থাকে কি। যদি কিছু হয়। তারপর, সবাই নিজেকে ভালবাসে, ও তাও বাসে না। তাই এত চিন্তা।

শোভাও অমলেন্দুর কথা না ভাবে এমন নয়। সে ভাবনার তলায় কোন অভিসন্ধি ছিল না, ছিল নিছক মঙ্গল কামনা। কণার জন্য দুঃখ অনুভব করত সে। অবশেষে শোভাও কণার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাবনায় পড়ল। সত্যিই তো !

একদিন বলল, লোকটাকে অত ভাল মানুষ কেন মনে হয়েছে তোর ?

মন্দ মানুষ নয় বলেই।

প্রমাণ।

প্রমাণ দেবার সময় হয়নি পিসি। বলেই কণা বেরিয়ে গেল ডাক পিওনের প্রত্যাশায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল চিঠি হাতে নিয়ে। একুশদিন পর অমলেন্দুর চিঠি এসেছে :

অনেক দেরি হয়ে গেল পত্র দিতে। ঠিকানা ছিল না বলেই পত্র দেইনি। তুমি ঠিকানা চেয়েছ, বর্তমানে একটা ঠিকানা হয়েছে তাই পত্র দেবার ভরসা হয়েছে।

তোমাকে ছেড়ে আসার পর অনুভব করছি বিরাট শূন্যতা। সে শূন্যতা যে কি তা লিখে জানান সহজ নয়। হঠাৎ মনে হল এ রকম শূন্যতার মাঝে তুমিও হয়ত হাবুডুবু খাচ্ছ। তাই চিঠি লিখছি। যদি আমরা দুজনেই সব সময় মনে করি পরস্পরের পাশে আছি তা হলে এ শূন্যতাকে জয় করতে বোধহয় পারব। প্রতিদিন সূর্যোদয়ে দুজন দুজনকে স্মরণ করব তাহলেই আমাদের বস্তুনিষ্ঠা প্রমাণ হবে।—অমল।

চিঠি পড়ে শোভার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও প্রমাণ পেলে তো।

এবার তেল সিঁদুর গঙ্গাজল দিয়ে চিঠিটা তুলে রাখ। তোর জন্ম জন্মান্তরের সাধ পূরণ হল, কেমন !

কণা কোন উত্তর দিল না, সে ভাবছিল অজিতের কাছ থেকেও সে চিঠি পেয়েছে তাতে ছিল দুর্গন্ধ, আর এ চিঠি বহন করে এনেছে নির্মল জীবনের ইঙ্গিত। আচম্বিতে কণা শোভাকে জাপটে ধরে বলল, ঠিকই বলেছ পিসি। জন্ম জন্মান্তরের সাধ পূরণ হয়েছে !

তিনমাস পরে ফিরে এল অমলেন্দু। সঙ্গে করে আনল মস্ত একটা তোরঙ্গ।

আমার সব সম্পত্তি এতে রয়েছে। তোমার হেপাজতে রইল। শরিকানা উভয়েরই।

কণা তোরঙ্গে ডালা খুলে অবাক হয়ে গেল। সোনারুপার জিনিষ থেকে আরম্ভ করে নগদ টাকা, একগাদা বই আর খাতা, সবই রয়েছে তাতে। হেসে বলল, এগুলো রক্ষা করব কি করে। যদি চুরি যায় !

যায় যাবে। যথা স্থানে যথার্থ ব্যক্তির হাতে তুলে দিলাম। এখন তোমার ভাগ্য।

কদিন থাকবে তো?

এ প্রশ্ন কেন কণা।

তোমাকেই বড় ভয়।

যাবার যদি হত তা হলে ফিরবার কথা ভাবতাম না। সমগ্র বিশ্ব চলছে হৃদয়ের আকর্ষণে। মানুষের জীবনের হৃদয়ে আকর্ষণ হল সূর্যের মত। সূর্য সৌরজগতকে আকর্ষণ করে রাখে আবার গ্রহ নক্ষত্রকে উজ্জ্বল করে। মানুষের হৃদয়ও তেমনি নরনারীর জীবনকে আকর্ষণ করে রাখে, নরনারীর জীবনকে উজ্জ্বল করে। কক্ষচ্যুত সূর্যকে যদি কল্পনা করতে পার তা হলে হৃদয়হীনতার দুর্বলতাও বুঝতে পারবে। তখন সব ভেঙ্গে লোপাট হয়ে যাবে। সেদিন আমি নয়, তুমিও অস্থির পদক্ষেপে ছুটতে থাকবে অনিশ্চিতের সাথে। তোমার চেয়ে বিশবছর আগে আমি জন্মেছি, সেই দীর্ঘ বিশটা বছর আমাকে জানতে দিয়েছে অনেক কিছু। আর জানবার মাশুলও দিয়েছি যথেষ্ট।

বয়সের প্রাচীর তুলে পালিয়ে যেতে চাও বুঝি। গম্ভীরভাবে বলল কণা।

হায়রে বোকা মেয়ে। বিশবছর আগে জন্মে চুলটা পাকিয়েছি ঠিকই। মনটা পোক্ত করেছি খুবই বেশি, সেই সাথে শিখেছি অনেক, অনেক। মেকি আর আসল চিনবার ক্ষমতা আমার কিছুটা হয়েছে বই কি। বয়স বিশ আর বাহান্নতে একই থেকে গেছে, সেটাই আমার পরম লাভ।

শোভা এসে চুপ করে বসেছিল। তাদের কথার মাঝে কথা দিয়ে বলল, কিন্তু কবি, কাব্য আর বাস্তব তো এক নয়।

অমলেন্দু হাসল, বলল, আপনার কথা মিথ্যা নয়। কবিকেও তো বাস করতে হয় এই মাটির ধরণীতে। সেখানে সুখ আছে, দুঃখ আছে, সেগুলোকে ভুলে কোন ভাবুক কবি চলতে পারে না। যারা চলতে চায় তারা অনুভূতিহীন উন্মাদ। আমার কথায় কাজে কোন সময় উন্মাদ বলে মনে হয়েছে কি! তা যদি না হয়ে থাকে তা হলে আমাকে আমার পরম লাভ থেকে বঞ্চিত করতে কেউ চাইবে কি!

শোভা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, আপনার সঞ্চয় বুঝি এ তোরঙ্গে।

জীবনে কোন কিছুই সঞ্চয় করতে পারিনি বোন। একটি মাত্র সঞ্চয় হল এই কণি! তাও ভয় কম নয়। পরস্ব অপহরণের লোক ওৎ পেতেই হয়ত রয়েছে। তাই সতর্ক আমার পদক্ষেপ। ঐ যে তোরঙ্গের বস্তুগুলো, ওগুলো কুড়িয়ে পাওয়া বিত্ত যা পেতেও কষ্ট হয়নি, দিতেও কষ্ট হবে না।

শোভার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। বলার স্পৃহা আপনা থেকেই লোপ পেল।

অমলেন্দু মৃদু হেসে বলল, এক কাপ চা।

শোভা ত্বরিত পদে উঠে গেল রান্না ঘরের দিকে।

পিসি যেতে চাইছে, বলল কণা।

কেন?

পিসি কিছুই বলছে না। কাকাবাবুর চিঠিতে মনে হল, বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

সু-সংবাদ।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। এখন দেখছি সংবাদ বটে তবে সু নয়। ইংরেজি সুয়ের কাঁটার মত পায়ে বিঁধছে। ও নিজে পছন্দ না করে বিয়ে করতে চায় না।

মানে?

ও বাজিয়ে নিতে চায় জীবনসঙ্গীকে।

লক্ষণ খুব কল্যাণকর মনে হচ্ছে। হাসল অমলেন্দু।

নাইটে বেরিয়েছে কণা। বাড়িতে রয়েছে শোভা আর অমলেন্দু।

শোভা খেতে দিয়েছে অমলেন্দুকে। খেতে খেতে মুখ নিচু করেই জিজ্ঞেস করল, শুনলাম আপনি চলে যাচ্ছেন। কাজলদীঘি আর ভাল লাগছে না।

আমার তো থাকার ইচ্ছাই রয়েছে। তবু ভাল লাগলেও যেতে হবে।

শুনলাম শুভ খবর।

শুভ নয় লাহিড়িমশাই। অশুভ বলতে পারেন। মেজদা বিয়ে দিতে চায়। 'বিয়ে করব নিশ্চয়ই, কিন্তু মেজদার কি বড়দার কারও মতে নয়। আমার পছন্দ মত!

হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে জাগল কেন ?

কণির বাবার কথা শুনেছেন ?

না। দরকার হয়নি।

ভালই করেছেন। যারা রূপ দেখে মেতে ওঠে তাদের দলে আমি নই। কণিকে দেখেই বুঝতে পারছেন ওর বাবা অথবা মা ছিল কত রূপের অধিকারী। কণি রূপ পেয়েছে ওর বাবার। তার রূপের আগুনে পুড়েছে অনেকে। আর যন্ত্রণা সহ্য করছে কণির মা আর তার সন্ততি। তাই বাছাই করার দায়িত্ব নিয়েছি আমি। ভবিষ্যতে কষ্ট যাতে না হয় তারই জন্য।

লোম বাছতে কম্বল লোপাট হবে যে।

তা হোক। চিরজীবন কুমারী থাকব। যেদিন দেখব আপনার মত আত্মহারা হয়ে কেউ আমাকে ভালবেসেছে সেদিনই আমি বিয়ে করব। ভালবাসাটা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় না, আপনার সাহচর্যে বুঝেছি।

চমকে উঠল অমলেন্দু। শোভার মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। হাতের মুঠিতে ভাতের গ্রাস রয়ে গেল।

শোভা হেসে বলল, কি ভাবছেন !

না, কিছু না। বৃদ্ধের ধ্যান করছেন আপনিও।

বৃদ্ধ নয় তার মনটা। ঐ মনের ওপর অধিকার বিছিয়ে দিতে চাই।

অমলেন্দু কোনরকমে খেয়ে উঠে গেল।

পরদিন সকালে কণা আসতেই অমলেন্দু বলল, আজই আমি বেরিয়ে যাব।

এমন কথা তো ছিল না। তুমিই বললে কয়েকদিন থাকবে।

ভেবেছিলাম থাকব। তা আর হল না। অবস্থা মানিয়ে চলতে হয় কণি। মনে হচ্ছে আমি খাপ খাওয়াতে পারব না।

কি হয়েছে বল না। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল কণা।

শুনে কাজ নেই। আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব বেশি এগিয়ে গেছ যার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে শোভার মনে।

কেন ! আমি তো এমন কিছু করিনি।

করেছ অথচ নিজে টের পাওনি। শোভার মনে ঈর্ষা জাগিয়েছ তুমি। এর পরিণাম ভয়ঙ্কর হতেও পারে।

কণা হতাশভাবে বলল, unfortunate.

অমলেন্দু ক্ষুণ্ণস্বরে বলল, কেবল unfortunate নয়, ভবিষ্যতে unhealthy হতে পারে। শোভা যদি যেতে চায় তার যাবার ব্যবস্থা করে দিও, নইলে অসহনীয় হবে তোমার জীবন। আমিও সুস্থির হতে পারব না।

চল কোথাও চলে যাই। হতাশার সুরে বলল কণি।

এখনও সময় হয়নি। সময় হলে ডেকে নেব। হতাশ হবার মত অবস্থা এখনও নয়।

পরের দিন অমলেন্দু যাবার ব্যবস্থা করতেই শোভা এসে বলল, আমি যাব আপনার সাথে।

কোথায় ?

আমি বাড়ি ফিরব, আপনি পেৌঁছে দিয়ে আসবেন।

এত বড় দায়িত্ব আমার মাথায় তুলে দেবেন না বোন। আমি অতি দুর্বল দেহী, দুর্বল আমার মন।

আমি পদহীন নই, আদি অকৃত্রিম পা দুটো আমার আছে। আপনি কেবল মাত্র সঙ্গী। এর বেশি কিছু নন।

অমলেন্দু অসহায়ভাবে কণার মুখের দিকে তাকাতেই কণা ইঙ্গিতে সম্মতি জানাল।

আবার অমলেন্দু এল মাসখানেক পরে।

কণা জিজ্ঞাসা করল শোভার কথা। অমলেন্দু হেসে বলল, শোভার মাথায় ভূত ঢুকেছে। ওঝা নেই। যাকে সে ওঝা মনে করে তাতেই ভূত, তাই সারবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

কি বলল সে ?

বলবার সাহস তার নেই। তবুও অব্যক্ত মনের ইচ্ছাটাকে নানা কথায় জানিয়ে দিতেও কসুর করেনি।

কণা ভাবছিল।

অমলেন্দু বাধা দিয়ে বলল, একটা কথা বলব।

বল।

তোমার বৃত্তি পরিবর্তন সম্ভব নয় কি !

মোটেই নয়। আমার ইচ্ছে নয় এ বৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাই। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত তাতো জান। এর চেয়ে আর কি পাব বলতো। এই তো বেশ আছি। চাকরিকে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি তাই অবসাদ অনুভব করি না।

ভেবে বলব। তবুও তোমার ধর্ম তোমাকে সম্পূর্ণতা দিক। বৃত্তির চেয়ে বৃত্তির মানবতাবোধ তীক্ষ্ন হয়ে উঠুক।

সেদিনই অমলেন্দু ফিরে গিয়েছিল। আবার যেদিন এল সেদিন তার চেহারা দেখে চমকে উঠল কণা। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখভর্তি। কাপড়-জামার রং বদলে গেছে। কণা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোমার ?

শুকনো হেসে অমলেন্দু বলল, না কিছুই হয়নি।

হয়নি বললেই শুনব, কি হয়েছে বল। সেই শিমুলতলায় সেদিন এরকম চেহারাই দেখেছিলাম।

বয়সটা বেড়েছে, মৃদুস্বরে বলল অমলেন্দু।

আমারও।

ব্যবধান যে অনেক।

তাতে লোকসান কোথায় !

দেহের।

মনের তো নয়।

তাই বা কি করে বলি। হাসল অমলেন্দু।

কাপড়-জামা ছাড়, স্নানটান কর। আমি খাবার ব্যবস্থা দেখি।

সবই হবে। তুমি বস, আমিও বিশ্রাম করি।

কিছু বলতে চাও বুঝি।

হাঁ। আজ মনে হচ্ছে তুমি যেন বদলে ফেলছ জীবনের ধারা। আমি পারলাম না। সারা জীবনটা ধরে বয়ে চলেছে বিদ্রোহ আর বিক্ষোভের তুফান। সেই জীবনের সাথে তোমার জীবন জড়িয়ে নেবে কেন ! কেন তুমি নিজেকে করে তুলতে চাইছ রিক্ত, আশাহত। নারীর চিরকাম্য মা হবার সুযোগও তুমি হয়ত পাবে না। এত জীবন নয় কণি। জীবনে অনেক যেমন নেবার আছে, তেমনি দেবার আছে অনেক। তুমি নিতেও

পারবে না, দিতেও পারবে না। একদিন আসবে বিরাট অনুশোচনা, সেদিন সান্ত্বনা খুঁজে পাবে না।

কে বলল পাব না! লাঞ্ছিত নারীত্ব আমার মায়ের মাতৃত্ববোধকে ব্যথিত-দলিত করেছে। সে জীবন তুমি কল্পনা করলেও শিউড়ে উঠবে। এমন মাতৃত্ব আমি চাই না। সন্তানের জন্য কালিমা রেখে যাব না অমল। সুস্থ জীবনের স্পন্দন যদি না থাকে, তা হলে মাতৃত্ব হবে অভিশপ্ত। আমি চাই না সে মাতৃত্ব। আমি না পেয়ে রিক্ত থাকতে চাই, পেয়ে অভিশপ্ত হতে চাই না। চাই না। চিৎকার করে উঠল কণা।

স্থির হও কণি। চিরদিনের কাঙ্গাল যার মন তাকে প্রবোধ দিতে পারব না। তবুও বলব, সংসারে ফিরে যাবার পথ এখনও উন্মুক্ত রয়েছে, তুমি সংসারকে বেছে নাও।

আমি তোমাকে বুঝতে শিখেছি। আমার জীবনধারা আমি বেছে নিয়েছি। আমাকে আর নতুন পথের সন্ধান দিতে চেও না। তুমি আমাকে স্ত্রীর অধিকার না দিলেও আমি তোমাকে স্বামীর অধিকার দিয়েছি। সে অধিকার কোন নিয়ম বা চুক্তির অধীন নয়। আমাকে মার্জনা কর। যা বলেছ তা আর বলে আমাকে উৎপীড়ন কর না। আমি চাই না কিছু, আমি মনের প্রশান্তি নিয়েই বাঁচতে চাই।

অমলেন্দু চিন্তিত ভাবে বলল, আমার দিন তো শেষ হয়ে এসেছে।

কার দিন কবে আরম্ভ হয়েছে বলতে পার? যার সূচনা আছে তার সমাপ্তিও আছে। দিনের হিসাব করে মানুষের হিসাব হয় না অমলেন্দু।

জানি। তবুও ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না।

দিনের পর দিন কাটে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

অমলেন্দু মাঝে মাঝে আসে। দু একদিন থাকে আবার চলে যায়। কোথায় যায় তা কখনও বলেনি কণাকে। কণাও জিজ্ঞেস করেনি। কাজলদীঘির হাসপাতালের জীবনে নতুনত্ব কিছুই নেই! মাঝে মাঝে ডাক্তার বদল হয় নার্স বদল হয় আবার চলতে থাকে সমান্তরাল জীবন যাত্রা।

কণা পাশ করে এসেছে মেট্রনশিপ। সে স্থান পেয়েছে মিস্ অধিকারির কোয়ার্টারে। মিস্ অধিকারি চলে গেছে সদরে। এলিসও

চলে গেছে আদমপুরে, সুচরিতা গেছে গোলাপনগরে। নতুন নার্স এসেছে তমাললতা। পাশ করেই প্রথম পোস্টিং, আর এসেছে বিধবা অনুলেখা। বেলা দেব ফিরে এসে উঠেছে কণার কোয়ার্টারে।

কাজলদীঘির কিনারায় মাঝে মাঝেই কণা এসে বসে। তালগাছের ছায়া এড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দীঘির জলের ওপর। বিকেলের সূর্য সোনালি আলো ছড়িয়ে দেয় কাজলদীঘির কালো জলে। মুগ্ধ হয়ে বসে বসে দেখে কণা। এমনি ধারা বসে থাকত অমলেন্দু। ফিরে এসে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসত কবিতা। অমলেন্দু চলে গেলেই কণার এসব কথা বেশি করে মনে হয়। মাঝে একবার নতু এসেছে ছুটি পেয়ে। ভাইবোনে সামনের মাঠে নার্সদের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলেছে। দুপুর বেলায় আমের বাগানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আম কুড়িয়েছে। মোটামুটি একঘেয়ে জীবনে কিছুটা নতুনত্বও দেখা দিয়েছে সাময়িক ভাবে। কণা চাকরির ধর্মটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেই অবসাদ থেকে রেহাই পেয়েছে।

অনেক দিন অমলেন্দু আসেনি। কোথায় গেছে তা জানায়নি। কবে যে আসবে তাও অজ্ঞাত।

কণার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গরুর গাড়ি। কণা ছুটে গেল দেখতে। গাড়ি থেকে নামল তার মা, বিধবার বেশ পরিধানে। সঙ্গে একটি মেয়ে।

কার মেয়ে! দীপালির মেয়ে নিশ্চয়!

কণা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল।

একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। উৎফুল্লভাবে বলল কণা।

খবর দেবার সময় পেলাম না। মেয়েটাকে দীপার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দীপা ইদানিং মেয়ের কোন খবর করছে না। তাই ভাবলাম যার মেয়ে তার কাছেই দিয়ে আসি। এ বয়সে আর ঝামেলা সহ্য হবে না।

কণা বলল, দীপাদি মেয়ের কথা ভুলে গেছে। সে যে নতুন সংসার পেয়েছে। এই মেয়ে যে তার পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠবে তা তো তুমি বুঝছ। সন্তানের চেয়ে সংসার ওদের বড়! গোপনতা দিয়ে জীবনকে করে তোলে ভারাক্রান্ত। আমিও এই ভয় করেছিলাম। দীপাদি বদলি হয়ে চলে গেছে অনেক দূরে।

মমতাময়ী চিন্তিত হল।

রাতে খেয়ে দেয়ে মমতাময়ী দীপালির মেয়েকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়েছিল। কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠল। কণা তখন ডিউটিতে। লণ্ঠন উস্কে দিয়ে উঠে এল!

দরজা খুলেই দেখে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

কাকে চান? মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

কণা মজুমদারকে।

সে কাজে গেছে।

ওঃ আচ্ছা। আপনি?

আমি তার মা।

ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করে অন্ধকারের মধ্যেই ফিরে গেল।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর মমতাময়ীর মনে হল, ভদ্রলোকের নামধাম জানা উচিত ছিল। রাত ন'টার সময় হাসপাতালে না গিয়ে কেনই বা বাসায় এল। নিশ্চয়ই কণির পরিচিত। ভুল হয়ে গেছে। উপায় নেই। আবার শুয়ে পড়ল মমতাময়ী। কিছুক্ষণ বাদে আবার কড়া নাড়াব শব্দে লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে কণা আর সেই ভদ্রলোক।

কণা বলল, এই আমার মা। আর এ হল অমল। এর কথাই শোভার কাছে শুনেছ, আমিও লিখেছি।

রাতের বেলায় আবার স্টোভ জ্বলল। আবার রান্না হল।

বারান্দায় পরিপাটি করে বিছানা পেতে মশারি টাঙ্গিয়ে কণা বলল, এখানে শুয়ে পড়!

মন্দ নয়। যা গরম, বাইরেই ভাল।

থাকবে তো ক'দিন!

প্রত্যেক বার একই কথা জিজ্ঞেস কর কেন? বলেছি, সময় হলেই ডেকে নেব। সময় বোধহয় হয়েছে! তবে আমার থাকার পেছনে তোমার অবদানও থাকা চাই।

তা বটে। বিনা সুতোর মালা নিয়েই ভয়, যদি জোড় খুলে যায়।

যদি কখনও যায় তা তোমার কৃপায় অথবা অকৃপায় খুলবে।

চুপ করে গেল দুজনে।

অমলেন্দু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, সেই টাকাগুলো আছে কি !

কেন বলত ?

কিছু জমি কিনব মনে করেছি।

তোমার টাকা যেমন রেখে গেছ তেমনি আছে, এমন কি বাক্সের বই-খাতাগুলোও।

আমার টাকা ! কি বলছ !

তোমার নয়তো আমার ? তুমি রেখে গেছ তোমার টাকা আর আমি বলব আমার টাকা, তা কি হয় !

আমার টাকা তোমার টাকা নয় ! আমার আর তোমার পার্থক্য আছে কি ?

কণা নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, ভুল হয়েছে। জিবের দোষ। রাগ কর না। তোমার টাকা আমারই টাকা।

এই তো আসল কথা। শোন, একখানা বাড়ি করেছি কয়েক বছর আগে। তোমাকে বলিনি। তোমাকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। অনেকদিন ভেবে ঠিক করেছি, চমকাবার দরকার নেই। দুজনে এইবার যাব সেই বাড়িতে। তোমার কথা মত তোমার সেই অভিরাম, তাকে রেখেছি সেখানে। সেই দেখাশোনা করে। এবার শীতে আমরা যাব সেখানে। জমবে ভাল। কলেজের অধ্যাপক বিপুলবাবু, নির্মলবাবু—এরা এতদিন কণিকা মজুমদারের হদিস পায়নি। এবার তাদের হদিস দেওয়াও হবে। পারবে ছুটি নিতে শীতকালে।

নিশ্চয়ই পারব। এতদিন এ সব কথা বলনি কেন ? আমাকে গোপন করতে চেয়েছিলে বুঝি।

বোকা মেয়ে। বাড়ির দেওয়ালে কণা মজুমদারের প্লেট টাঙিয়ে রেখেছি কি গোপন করতে ! আসলে আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে চমকে দেবার। এখুনি তো বললাম। তুমি তাক্ লেগে যাবে বাড়ি দেখে। আমার সব কিছু দিয়ে তোমার জন্য ঘর তৈরি করে দিয়েছি। এবার ঘর বাঁধব আমরা।

কণা অমলেন্দুর বুকে মাথা রেখে বলল, সত্যি !

সত্যি !

আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

চলবে কি করে ?

তুমি আছ কি করতে !

তা বটে। যাও শুয়ে পড়গে।

কণা উঠে গেল। রাত তখন বারটা বেজে গেছে।

পরদিন সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল কণা আর মমতাময়ীর কথোপকথন।

কাল অনেক রাত অবধি গল্প করছিলে বুঝি? জিজ্ঞেস করল মমতাময়ী।

হাঁ, অমল একবার এল একটা তোরঙ্গ নিয়ে! তোরঙ্গে ছিল অনেক টাকা। তুলে দিল তোরঙ্গ আমার হাতে। কাল জিজ্ঞেস করছিল, সে টাকা আছে কি না? বললাম, তোমার টাকা ঠিকই আছে। অমল শুনেই মুখ ভার করল। সে বলল, আমার আর তোমার টাকার কোন পার্থক্য আছে কি! নেই কিনা জানি না। আমাদের কাকাবাবু ছোটবেলা থেকে খাইয়ে-পড়িয়ে বড় করেছে। তাকেই কত কথা বলি আর ওকে বলতে বাধা কি! ওর সঙ্গে সম্পর্কই বা কি! পথে দেখা, পথেই বিদায়। তুমিই বল।

কণা বোধহয় এই হৃদয়হীন অসত্য উক্তির পরিণতি সম্বন্ধে একবারও চিন্তা করেনি। নিজেকে মায়ের কাছে বিশেষভাবে অমল বিষয়ে অনাসক্ত জানাতে এই মন্তব্য করেছিল। সামান্য কিছুর ফলাফল যে জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে এটা না ভেবেই অসতর্কভাবে কথাটা বলে ফেলেছিল।

মমতাময়ীর উত্তর শোনা গেল না।

অমলেন্দুর কানে কে যেন গরম সীসা ঢেলে দিল। এর চেয়ে বধির হওয়া অনেক ভাল ছিল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, ধীরে ধীরে হাটতলার পথ ধরল। চুপ করে বসে রইল একটা আমগাছতলায়। অনেক বেলায় ফিরে এসে কোনরকমে স্নানাহার করে শুয়ে পড়ল মাদুর পেতে। সারাদিন কারও সাথে ভাল করে কথা বলল না। নিজের মনেই মাঠে মাঠে বেড়াল বিকেলবেলায়। হঠাৎ তার মনে হল অবজ্ঞা আর অবহেলাই তার প্রাপ্য ছিল। তাই পেয়েছে সে। সারা জীবন সে খুঁজেছে অকৃত্রিম স্নেহের নীড়, সে নীড় সে আর পাবে না। ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে। রাতের খাওয়া শেষ হতেই নিজেই বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

কণা ডিউটি থেকে ফিরে এসে দেখে অমলেন্দু গত রাতের মত বিছানা পেতে শুয়ে আছে।

মশারি তুলে ডাকল, অমল।

অমলেন্দু সারা দিল।

ঘুমোওনি।

ঘুম আসছে না। যাও, তুমি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়।

তাড়িয়ে দিতে চাও বুঝি।

উল্টোটা মনে হচ্ছে।

ভনিতা রাখ। কি বলতে চাও।

সব বলা শেষ হয়েছে কণি এখন একটু ভাবতে চাই। বিশ্রাম চাই।

অমলেন্দুর বুকের ওপর হাত রেখে কণা বলল, যদি বিশ্রাম না দিই।

ভাবব, তুমি শুধু আত্মকেন্দ্রিক নও, মহা নিষ্ঠুর।

কি বললে!

শুনতে পাওনি।

পেয়েছি। এই কি তোমার হিসাব।

হিসাব বটে তবে ভুলও হতে পারে। জমাখরচ এখনই কি শেষ করতে চাও?

কণা আত্মসম্বরণ করতে পারল না। অভিমান যেন পরিণত হল বিদ্বেষে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমার ভাল মানুষির পেছনে যে অসৎ অভিপ্রায় নেই তাই বা কেমন করে মনে করব!

করলেও দুঃখ নেই? ধীর কণ্ঠে জবাব দিল অমলেন্দু। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এত দেরিতে যে তুমি উপলব্ধি করতে পেরেছ, এটাই আশ্চর্য! তবুও বুঝেছ আমাকে, সেজন্য ধন্যবাদ। আমাকে সেবা করা, আমার জন্য না ঘুমিয়ে রাত কাটানো, এ সবই অভিনয়? তোমার মনে কি কোন অনুভূতি জাগেনি। এ কি অভিনয়।

হাঁ অভিনয়, অভিনয়! আজ একথা বলবার সুযোগ পেয়েছ তুমি। কণা তোমাকে কোন দিনই ভালবাসেনি, ভাল লেগেছিল, তাই তোমাকে সে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। ভাল লাগা আর ভালবাসা এক জিনিষ নয় অমল। এটা কেন বুঝতে পারনি।

অমলেন্দু কোন কথারই প্রতিবাদ করল না। পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে রইল।

কথা বলছ না কেন? জবাব দাও। আমাকে নিয়ে কেন খেলছ এত দিন ধরে।

শুনতে চাও! জীবনের সব প্রশ্নকে কদর্থ করে অপরের কাছে কৈফিয়ত চাও কি?

হাঁ।

অভিমান দিয়ে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। তোমার মত মেয়েরা আত্মরক্ষার তাগিদে যত সহজে চেনাকে অচেনা করে তোলে, অথবা সত্য গোপন করে অনেক পুরুষ তা পারে না। কেন পারে না. সে কথা ব্যাখ্যা করতে চাই না। তবে কাব্যের নারী আর বাস্তবের নারী এক নয়। তোমার মত নারী নির্মম, হৃদয়হীন, তারা ভালবাসে না, তারা খোঁজে পুরুষের আশ্রয়। আত্মকেন্দ্রিকতাই তার ধর্ম। নিজের স্বার্থে সব কিছু পারে। তুমি ব্যতিক্রম নও। তোমাকে যদি ভালবাসতে নাও পেরে থাকি, তবুও আমার ঘৃণা কেন তোমার প্রাপ্য হবে We can part as friends তুমি তোমার কাজে যাও, আমাকে শুধু ক্ষমা কর। তোমারে ক্ষমা সুন্দর চেহারাটাই যেন দেখতে পাই। আমার জমাখরচ শেষ হয়নি, কিন্তু তোমার খাতায় জমাখরচ লেখবার আর স্থান নেই। আমি ক্লান্ত, বিরত, আমাকে মুক্তি দাও। আমার দেবারও নেই, নেবারও নেই। অক্ষমের প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশ আর সহ্য করতে পারছি না।

এই কি শেষ কথা।

শেষ কিনা জানি না, তবে এইটে আমার পাঠ, তোমার পাঠ্য।

কণা কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আজই প্রথম সে কঠিন কৈফিয়ত চেয়েছে অমলেন্দুর কাছে। লজ্জিত হল সে কিন্তু ফিরিয়ে নেবার উপায় ছিল না। অমলেন্দুর মনের কথাটা যদি জানতে চেষ্টা করত তা হলে হয়ত অঘটন ঘটত না। সে মনে করল অমলেন্দু তাকে আঘাত দিতে চায়। প্রত্যাঘাত করবার অধিকার তারও তো আছে। বিগত দিনের ইতিহাস যদি ভাল করে মনে মনে আউড়ে নিত তা হলে কোথায় যে ব্যথা, কোথায় যে আঘাত, কোথায় যে সর্বনাশের

সূত্র তা সে ভাল ভাবেই বুঝতে পারত। কণা সে কথা না ভেবেই ক্ষুণ্ণ মনে উঠে গেল নিজের ঘরে। সারারাত এপাশ ওপাশ করে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠতে দেরি হয়েছিল কণার। একটু বেলাতে উঠে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। অমলেন্দুর বিছানা তখন খালি। সদর দরজা খোলা। যেমন মশারি টাঙ্গানো ছিল তেমনিই আছে। নেই শুধু অমলেন্দু আর তার ব্যাগটা। মশারি টেনে তুলতেই নজর পড়ল একখানা সরকারি কাগজ আরও একটুকরো কাগজ। সরকারি কাগজখানা জমির দলিল আর ছোট্ট চিঠিখানায় লিখে রেখে গেছে তার বিদায় বাণী। অমলেন্দু পাদপীঠ থেকে অভিমান নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রেখে গেল অসীম বেদনা শুধু তার চলার পথের সাময়িক সঙ্গিনী কণার জন্য। কণা তার বক্তব্য কাউকে বলতে পারল না। সামান্য ভুলে পেয়েও হারাবার ব্যথা যে কত মর্মান্তিক তা হাড়ে হাড়ে বুঝল।

কণার চোখ ভেঙ্গে অশ্রুর বন্যা নেমেছিল সেদিন।

কোনরকমে আত্মদমন করে চোখ মুছল আঁচল দিয়ে। চেয়ে রইল সেই সম্ভাবিত পথের দিকে। যে পথে অমলেন্দু চলে গেছে আজই সকালে। তখনও আশা করছিল অমলেন্দু ফিরে আসবে। কিন্তু সে আর এল না। অভিমান হল সবচেয়ে বড়, ভালবাসা হল তুচ্ছ !

দশ

কণা মজুমদারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাহিনী হঠাৎ বাধা পেল। অভিরাম সকালবেলায় একটি দুঃসংবাদ দিতেই বিশেষ ভাবে চিন্তিত হল কণা। অভিরামকে বার বার জিজ্ঞেস করতে থাকে, সত্যিই কি পাগলা তোর্সা কুল ভাঙ্গছে, ভাঙ্গনের গতি কি সত্যিই তার বাংলোর দিকে।

আকাশের কালো মেঘের দিকে হাত বাড়িয়ে অভিরাম বলল, যা মেঘের অবস্থা তাতে যদি আবার বৃষ্টি নামে তাহলে নদীর দক্ষিণ-পাড় ভেঙ্গে পড়তে পারে।

কণা জানতে চাইল, এর আগেও কি এমন হয়েছে ?

না মা। কয়েকবার মনে হয়েছে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামলে অঘটন ঘটতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আকাশ দয়া করেছে। এবার কাল-জানিতেও জলের ধারা নেমেছে। ভয়ানক বেগে জল নামছে, ছুটছে সংকোশ নদীর দিকে। এবার তোর্সার পালা। আজ সকালেই দেখে এসেছি বড় বড় গাছ পাহাড় থেকে জলের স্রোতের সঙ্গে উল্টে পাল্টে ভেসে আসছে।

কণা আবার জানতে চায়, শহরের অবস্থা কি ?

শহরবাসী এই রকম বন্যা অনেক বার দেখেছে। তারা নিরাপদ জায়গায় ইতিমধ্যেই চলে গেছে মা। ভাবছি।

কি ভাবছ অভিরাম ?

আমরাও কোন নিরাপদ জায়গায় যাব কি না।

না। আমার বাড়ির কোন লোকসান হবে না অভিরাম। আমি তোমার বাবুর সন্ধানে এসেছি। ঝড় বৃষ্টি আর বন্যার প্রকোপ দেখে আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই আর বাবু সেই সময় ফিরে এসে আমাদের দেখতে না পায় তা হলে কিন্তু যে কোন অঘটনও ঘটতে পারে।

বলতে বলতে থেমে গেল কণা।

তার মনে পড়ল ফেলে আসা একটা দিনের কথা। সেদিনও আকাশ ভেঙ্গে নেমেছিল অশ্রান্ত বৃষ্টি। সেদিন পাহাড়েও হয়েছিল অবিরত বর্ষণ। মহানন্দায় নেমেছিল প্রবল জলের ঢল। নদী পেরিয়ে ওপারে যাবার ছিল খুবই প্রয়োজন। এ্যাম্বুলেন্সে ছিল মরণাপন্ন রোগী। নৌকার সাঁকোতে এ্যাম্বুলেন্স তুলতে গিয়ে থেমে গেল ড্রাইভার। জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ ড্রাইভার দাদা। নদী পেরানো যাবে না ?

যাবে, তবে বিপদ রয়েছে দিদিমণি। এই স্রোতের মাঝে কোন নৌকা যদি হঠাৎ উল্টে যায় তা হল রোগীর সঙ্গে আমাদেরও সলিল সমাধি ঘটতে পারে।

আমি ভাবছি, আমাদেরও চেয়েও এই রুগীর জীবনের মূল্য অনেক বেশি। আমরা মরলে হয়ত কেউ কেউ কাঁদবে কিন্তু এর বিনা চিকিৎসায় মরতে হলে প্রবোধ দেবার কেউ থাকবে না, গোটা পরিবার পথে বসবে। আমার কথা তুমি শুনবে দাদা ?

বলুন দিদি।

দৈবকে কেউ রোধ করতে পারে না। আমরা চেষ্টা করব। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য দায়ী হবে আমাদের ভাগ্য। সদর হাসপাতালে যে কোন উপায়ে পেঁছতেই হবে। এদিকে সিলিণ্ডারে অক্সিজেন ক্রমেই কম হয়ে আসছে। তুমি গাড়ি সাঁকোতে ওঠাও। আমাদের সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে। সতের নম্বর বেডের রুগীর অবস্থাও ভাল নয়। আমি না ফিরলে তাকে খাওয়াতেও পারবে না কেউ।

সেই দুর্যোগের মধ্যে নদী পার হয়ে সব কাজ শেষ করে তারা ফিরে এসেছিল কাজলদীঘির হাসপাতালে। সতের নম্বরে তখন অমলেন্দু বার বার জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছু না খেয়েই।

কণা কোনরকমে পোশাক বদলে ছুটে এল অমলেন্দুর কাছে।

একি! এখনও বুঝি কিছু খাওনি?

না।

রাগ করেছ। আমাদের তো সরকারি কাজ করতে ছুটতে হয় বাইরে।

অমলেন্দু চুপ করে রইল।

জান, কি দুর্যোগের মধ্যে আমাদের নদী পার হতে হয়েছে। যে কোন সময় নৌকাডুবি ঘটে আমাদের মৃত্যু ঘটতে পারত।

অমলেন্দু পাশ ফিরে ভাল করে কণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় করেনি?

না বললে মিথ্যা হবে, তবে এই হঠকারিতা নিয়েই তো আমার জীবন।

অমলেন্দু অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলল. ভয় মানুষকে অমানুষ করে তোলে। ভয়ের কাছে আত্মসম্পর্ণ করলে গুরুতর অপরাধ হয়।

আজ যখন অভিরাম তোর্সার ভয়ংকর অবস্থার কথা বলছিল তখন কণার মনে সেই পুরনো দিনের ঘটনার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী অমলেন্দুর মন্তব্য জাগল। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল নিষ্ঠুর তোর্সার পাগল স্রোতের দিকে।

অভিরাম পাশে দাঁড়িয়ে আবার বসল, কালজানি নদীতেও বান ডেকেছে মা, এবার ভেসে যাবে সব।

কণা অভিরামের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, পৃথিবীতে কিছুই

যায় না, যারা যায় তারা ফিরে আসে। তোর্সা ভাঙবে আবার গড়বেও, কালজানির জল বর্ষার পর গতিহারা হয়ে দুপাশকে উর্ব্বর করে তুলবে। ভেসে যাবে না কিছুই। আজও সে বিশ্বাস করে, অমলেন্দু ফিরে আসবে এই বাংলোতেই, সে কোন ক্রমেই এই বাংলোকে ছেড়ে দূরে যেতে চায় না।

অভিরাম কিছু বুঝতে না পেরে ভেতরে যাবার উপক্রম করতেই কণা বলল, তুমি এক কাপ চা করতে পার অভিরাম ?

কেন পারব না মা।

আমি এখানে বসে দেখব প্রকৃতির এই খেলা, তুমি ততক্ষণে চা করে নিয়ে এস।

মমতাময়ীব মেয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল জানালার পাশে। করগেট টিনের চালের ওপর তখন অঝোরে বর্ষার জল ঝরছে, টিনের চালের ওপব জল পড়ে যে আওয়াজ সৃষ্টি করছে তা তার কানে এসে ধাক্কা দিচ্ছে আর্তনাদের মত। তোর্সার জলস্রোত দুই পাড়ে ধাক্কা দিয়ে যে আওয়াজ তুলছিল তা অট্টহাস্যের মত শোনাচ্ছিল, তার সঙ্গে ক্রন্দনের মূর্ছনা ভেসে আসছিল ছাদের ওপর বৃষ্টির ঝমাঝম শব্দের সঙ্গে। সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করছিল মমতাময়ীর মেয়ে। তার এই উপলব্ধির অংশীদার আর কেউ ছিল না সেদিন।

এমন ভয়াবহ দুর্যোগের দিনে কেউ যে আসবে তা মমতাময়ীর মেয়ে আশা করেনি। মাঝে মাঝেই উঠে পায়চারি করছিল। দেখতে দেখতে দিনের ক্ষীণ আলোটুকু নিভে গিয়ে ঘোরতর অন্ধকার নেমে এসেছিল। বৃষ্টির জলেব অশ্রান্ত পতনের শব্দে কেমন একটা মূর্ছনা তাকে আবিষ্ট করেছিল। বারান্দায় মাঝে মাঝে চেয়ার টেনে বসে আকাশের বুকে বিদ্যুতের খেলা দেখছিল আবার চমকে উঠছিল মেঘের গর্জনে। কতক্ষণ এখানে বসেছিল তার খেয়াল ছিল না। লণ্ঠন জ্বেলে দরজার সামনে রেখে অভিরাম ডাকল, মা।

কিছু বলবে অভিরাম ?

চা তৈরি করেছি।

নিয়ে এস।

রাত বাড়তে থাকে। ক্রমেই বৃষ্টির প্রকোপও কমতে থাকে। দেখতে

দেখতে আকাশের মেঘ ভেঙ্গে সামান্য নীলিমা ফুটে উঠতে থাকে আর সেই ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চাঁদের আলো উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

মমতাময়ীর মেয়ে উঠে দাঁড়াল।

দরজা বন্ধ করে চেয়ার টেনে খেতে বসল।

অভিরাম পাশে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা!

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ আর কেউ এল না অভিরাম।

এই দুর্যোগে কেউ ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না।

তা বটে, কিন্তু!

কিন্তু কি মা?

আমার যে অনেক কথা বলা হয়নি।

ওরা আবার আসবেন। কালকেই আসবেন।

তা ঠিক! তোমার বাবু তোমাকে কিছু বলে যান নি।

যাবার সময় বলে গেছেন আবার আসবেন।

আসবেন! বলেছেন! তা হলে উনি আসবেনই। উনি তো মিথ্যা কথা বলেন না।

অভিরাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সে রাতে আর ঘুম এল না মমমতাময়ীর মেয়ের চোখে। এপাশ ওপাশ করতে করতে সকাল হয়ে গেছে। সামনের বাগানে হরতুকী গাছের ডালে বসে এক ঝাঁক কাক কোরাশে কা-কা ধ্বনি তুলছিল।

এই রকম একটা রাতের কথা মনে পড়ল তার। সেই রাতে ঝড় বৃষ্টি ছিল না। ছিল বিরামহীন শেয়ালের ডাক। কাজলদীঘির ধারে শেয়ালের রাজ্য ছিল বহুদিনের। সেই রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিল একদল সারমেয়। কুকুর আর শেয়ালের রণধ্বনি গোটা হাসপাতাল চত্বরটাকে বিষিয়ে তুলেছিল।

মমতাময়ীর মেয়ে শেষ রাতের রাউন্ডে বেরিয়ে অমলেন্দুর বেডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশের বেডের রুগীর কাতরানিতে অমলেন্দুর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

টিম টিমে আলোতে মমতাময়ীর মেয়েকে চিনতে পেরে অমলেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল, এখনও ডিউটি শেষ হয়নি ?

না। দেখতে এসেছি শেয়াল-কুকুরের লড়াইতে তোমরা ঘুমোচ্ছ কিনা।

অমলেন্দু হেসে বলল, লড়াই সর্বত্র! আজ যেখানে আছি সেটা ছিল একসময় লড়াইয়ের ময়দান। ক্ষমতা দখলের লড়াই হয়েছিল এরই ময়দানে পান্ডুয়াতে। সে জমানা বদল হলেও সেদিনের সর্বভোগী শেয়াল কুকুরের বংশধররা আজও লড়াই করছে শবদেহ পাবার আশায়।

বড়ই হেঁয়ালি তোমার কথায়।

তা বটে। সহজ সরল মানুষকে কেউ গ্রহণ করতে চায় না নার্স। যারা বাঁকা বলে তাদের স্থিতি বেশি। বাঁকা মানুষ ভাঙ্গবে-গড়বে, ভাল মানুষরা দেখবে আর সহ্য করবে।

মমতাময়ীর মেয়ে কথা না বলে এগিয়ে গেল।

সেদিনও আদিনার খোলা ময়দান থেকে যে আওয়াজ শোনা গিয়েছিল আজও সেই আওয়াজ তোর্সার ভয়ংকর ক্রন্দনের মাঝ দিয়ে সে শুনতে পাচ্ছিল। তোর্সার ক্রন্দন-এর কি শেষ নেই। এ যেন তারই ক্রন্দন।

ভোর হয়েছে।

সুস্থির হয়েছে মমতাময়ীর মেয়ে।

পরবর্তী দিনের জন্য যা ছিল সঞ্চিত তা উজাড় করতে প্রস্তুত হল মমতাময়ীর মেয়ে কণা মজুমদার।

এই দুরন্ত বর্ষার রাতে কারা যেন দরজার কড়া নাড়তেই অভিরাম গিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে নীতিশ গাঙ্গুলি, সমর সরকার ও সস্ত্রীক নির্মল সেন।

বিস্মিতভাবে কণা জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ এই দুর্যোগে ?

দুর্যোগ বলেই এলাম। তোর্সার ভাঙ্গন যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে আপনার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, তাই আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই এসেছি।

অশেষ ধন্যবাদ সমরবাবু আমার জন্য আপনাদের এই অযাচিত স্নেহ

ভালবাসা চিরকাল মনে থাকবে। অভিরাম, ঘরের আলো জেবলে দাও। চা জলখাবারের ব্যবস্থা কর। আপনারা ভেতরে এসে বসুন। উঃ, সবাই ভিজে চুপসে গেছেন। কাপড় জামা তো নেই। মিসেস সেনকে শাড়ি ব্লাউজ দিতে পারি।

কোন দরকার নেই। আমরা এখুনি ফিরে যাব। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

কিন্তু!

আপত্তি আছে। সাময়িক স্থান বদল নিরাপত্তার জন্য।

ভেবে বলছি। আপনারা বসুন!

সকলে চেয়ার টেনে বসতে না বসতেই অভিরাম চা আর বিস্কুট নিয়ে হাজির হল।

মমতাময়ীর মেয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে তাদের সামনে বসল।

আজ গরম গরম খিচুড়ি না খেয়ে কারও যাওয়া হবে না।

রাত যে কেটে যাবে।

যাক। আমার শেষ কথা শুনে যাবেন এটাই প্রার্থনা।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই মমতাময়ীর মেয়ে ড্রয়ার থেকে ভাঁজ করা একটা চিঠি বের করল।

কণা মজুমদার ছোট্ট একখানা ভাঁজ করা কাগজ তুলে দিল সমর সরকারের হাতে। বলল, এই চিঠি। সমরবাবু পড়ে শোনাল সবাইকে। কণার চোখের জলে মুখখানা তখন ভিজে উঠেছে।

সমর সরকার পড়ল :

> কণি, অনেক দিনই তোমাকে বলেছি আমার জীবন শুধু যন্ত্রণার আর লাঞ্ছনার। আমি চেয়েছি শান্তি আর সান্ত্বনা। পেলাম তোমার কাছে অবজ্ঞা আর অবহেলা। শুধু তাই নয়, অবিশ্বাস আর ব্যক্তিস্বার্থ তোমাকে গ্রাস করেছে। এমত অবস্থায় তোমার সঙ্গে একতালে পা ফেলা শুধু কঠিন নয়, অসাধ্য। তাই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ করলাম। আমি ছিলাম তোমার জীবনে দুঃস্বপ্ন, এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে তুমিও বাঁচলে। ইতি—
>
> অমল

কণার কাহিনী শেষ হতেই মুরগী ডেকে উঠল, পাখির দল গা ঝাড়া দিল গাছের মাথায়, পূবের আকাশে লালিমা দেখা দিল। সমর সরকার, নীতিশ গাঙ্গুলি আর সস্ত্রীক নির্মল সেন হাই তুলে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কণা বলল, সে আমাকে বলেছিল শীতের সময় আমাকে নিয়ে এখানে আসবে। সে তো মিথ্যা কথা বলে না, তাই ছুটি নিয়ে ছুটে এসেছি। এবার আপনারা বলুন আমার কি করণীয়! আসবে সে নিশ্চয়ই। যদি না আসে, যদি প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় প্রতীক্ষায়, তা হলে কি হবে! কাজলদীঘির কালো জলে আমার অপরাধ ধুয়ে ফেলতে হবে কি শেষ পর্যন্ত। বলুন আপনারা!

অনেকক্ষণ নীরবে অতিথিদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমার বিশ্বাস সে আসবে। বড়ই অভিমানী সে। আমি তো কোন অপরাধ করিনি। করলেও সে অপরাধ কি মার্জনার যোগ্য নয়। আমার অকৃত্রিম ভালবাসাকে সে কি অপমান করতে পারবে। এই বর্ষা যাবে, আবার শীত আসবে। বসন্তে গাছে নতুন পাতা গজাবার আগেই এই শীতেই সে আসবে, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। আমি তার স্মৃতিভরা এই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন, যেতে পারব না।

বাইরে তখন বৃষ্টির সামান্য বিরতি ঘটেছে। পূবের আকাশ কিছুটা লাল হয়েছে। অতিথিরা যেমন নীরব ছিল, তেমনি নীরবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। মমতাময়ীর মেয়েও অপলকে তাদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

———